সূচীপত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ।

নবম অধ্যায়।

গজনীদেশীয় রাজাদের রাজত্ব।

দশম অধ্যায়।

গোরদেশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

একাদশ অধ্যায়।

দিল্লীতে পাঠানদিগের রাজ্যারম্ভ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

খিলিজী রাজাদিগের রাজশাসন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তোগলক গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৈয়দবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

লোদীবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে হিন্দুরাজ্যের প্রাচীন বৃত্তান্ত ধারাবাহিক বা কালসমন্বয়িক নহে, অতএব সেই সকল বৃত্তান্ত না লিখিয়া মুসলমানদিগের রাজ্যারম্ভ অবধি ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতেছে। এই সময় অবধি যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত ও ধারাবাহিক, এবং তাহাতে কালের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভুত্ববৃদ্ধি মহম্মদ হইতেই বলিতে হইবে। মহম্মদ ৩৬৭২ কলি অব্দে আরব দেশে মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আপনাকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও অনুগৃহীত বলিয়া এক ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশ করেন। এই ধর্ম্মপুস্তকের নাম কোরান। উহার সার মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর এক, তাঁহারই উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, আর কোন দেব দেবী

বা প্রতিমার পূজা করা উচিত নহে। যাহারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া প্রতিমা পূজা করিবে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ খড়্গামুখে পাতিত করা উচিত। যাহারা এই ধর্ম্মের বৃদ্ধির যত্ন করিবে তাহাদের পরকালে পরম সুখ হইবে। আরবদেশীয় লোকেরা প্রথমতঃ এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে নাই, প্রত্যুত মহম্মদের প্রতি

খৃ ৬২২
সং ৬৭৯

অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাতে মহম্মদ মদিনাতে পলায়ন করেন। এই বৎসর অবধি হিজরী শক আরম্ভ হয়। তদনন্তর মহম্মদ মদিনাতে থাকিয়া অনেক মনুষ্যকে আপন মতাবলম্বী করেন। পরে বহু লোক সমভিব্যাহারে মক্কাতে আসিয়া অস্ত্রবলে আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন। সেই ধর্ম্ম এইরূপে চলিতেছে। অতঃপর

খৃ ৬৩২
সং ৬৮৯

মহম্মদ পুনর্ব্বার মদিনাতে গিয়া হিং ১০ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপদাভিষিক্ত ওমার খলিফা পদ গ্রহণ করিয়া বোগদাদের রাজা হইলেন। এবং রাজা প্রজা সকলের প্রতিজ্ঞা হইল, পৃথিবীর তাবৎ স্থানে একমাত্র ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, আর কোন ধর্ম্ম না থাকে, এবং সকল লোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আরবদেশীয় সমস্ত লোক

অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মযুদ্ধে বাহির হইল, এবং ধনলাভ ও পরমার্থ সুখের আশাতে তাহারা ঐ কর্ম্মে একান্তমনা হইয়া একেবারে দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। তাহাদের খড়্গাগ্রে বড় বড় রাজার নতশিরা হইতে লাগিলেন।

অদ্বিতীয় রুম রাজ্য ঐ সময়ে অসভ্য জাতীয়দের দৌরাত্ম্যে ছিন্ন ভিন্ন, এবং খৃষ্টানদিগের কলহানলে দগ্ধপ্রায়, হইয়াছিল। এবং পারসদেশীয় রাজাদিগের তাদৃশ বলবীর্য্য ছিল না, তাঁহারা কখন্ আছেন কখন্ নাই এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব কেহই আরবদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহারা মার মার শব্দে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং মহম্মদের মৃত্যুর পরেই পারসরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিল। তাহার দুইতিন বৎসর মধ্যে রুমরাজ্যান্তর্গত সিরিয়াদেশ জয় করিল। তৎপরে আফ্রিকাতে রোমানদিগের যাবতীয় অধিকার হস্তগত করিল, এবং ইউরোপে স্পেন ও ফরাস দেশ অধিকার করিল। এই প্রকার মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত না হইতেং ইউরোপ আফ্রিকা ও আসিয়া খণ্ডে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। আরবেরা সকল দেশ জয় করিতে লাগিল। তাহাদের খড়্গাগ্রে সকল লোক নত হইল। সুতরাং বোগদাদ দেশ অতি বিখ্যাত হইয়া

উঠিল, এবং তত্রস্থ রাজাদিগের নামে তাবৎ পরগণা কল্পান্বিতা হইল।

যখন এইরূপ সর্ব্বত্র আরবদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইল তখন স্বর্ণভূমি ভারতভূমি তাহাদের চক্ষে না পড়িবে ইহা সম্ভাবিত নহে। মহম্মদের

খৃঃ ৬৫৪
কং ৩৭৫৬

মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ হিং ৪৪ অব্দে, আরবেরা প্রথমতঃ কাবুল রাজ্য আক্রমণ করিল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাহারা পুনর্ব্বার মুলতান পর্য্যন্ত আসিল। তৎকালে তাহাদিগের এমন অভিপ্রায় ছিল না রাজ্যাধিকার করে, কেবল ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত হয় ইহাই তাহাদের মানস ছিল। ইতঃপূর্ব্বে যখন ওমার, অসমান, ও আলী বোগ্দাদের সম্রাট ছিলেন তখনও আরবেরা সিন্ধু দেশের সুন্দরী নারী হরণার্থ ঐ দেশে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত, তাহাতেই মধ্যে২ দ্বন্দ্বাদি হইত। এই উপলক্ষে তাহারা একবারে ঐ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জয় লাভ করিতে পারে নাই।

অনন্তর ওয়ালীদ সম্রাটের রাজত্বকালে সেই বিবাদ আরো গুরুতর হইয়া উঠিল। তাহার কারণ সিন্ধু নদীর তটে দেবাল নামক এক স্থানের নিকট একখান আরবদেশীয় জাহাজ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে

আরবরাজপক্ষ বসরাধ্যক্ষ সিন্ধুদেশের রাজাকে বলিলেন তোমাকে ইহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। সিন্ধুরাজ উত্তর করিলেন ঐ স্থান আমার রাজ্যভুক্ত নহে, অতএব আমি তজ্জন্য দায়ী নহি। বসরাধ্যক্ষ এই কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া, হিজরী ৯২ অব্দে, কাশীম নামে বিংশবৎসরবয়স্ক তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৬০৫০ সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ রাজার সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা কহেন, দাহার বা ধীর ঐ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন, মুলতান অবধি তাবৎ সিন্ধু দেশ তাঁহার অধিকার ছিল, এবং বাকরের নিকট আলর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

খৃ ৭১১
কং ৩৮১৩

আরবদিগের এই রীতি ছিল, কোন নগর আক্রমণে উদ্যত হইলে তাহারা নগরস্থ লোকদিগকে বলিয়া পাঠাইত তোমরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা কর দান কর। ইহাতে সম্মত না হইলে যুদ্ধ হইত। যুদ্ধের পর তাহারা যোদ্ধা ও যুদ্ধপারগ তাবৎকে বিনাশ করিয়া স্ত্রী বালক সকলকে রণবন্দী করিয়া বিক্রয় করিত।

কাশীম দেবাল জয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া মুসলমান হইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করিলেন না। তাহাতে তিনি ১৭ বৎসরের

ঊর্দ্ধ তাবৎ মনুষ্যকে খড়্গমুখে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিলেন। তৎপরে তিনি সেহান ও সালীম নামক দুই দুর্গ জয় করিলেন। অনন্তর রাজধানী আক্রমণ করিতে যাইবেন এমন সময় ধীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কাসীমের সৈন্য অধিক ছিল না, অতএব তিনি স্বদেশ হইতে সৈন্যের আসিবার আশ্বাসে তখন অগ্রসর হইলেন না। তৎপরে দুই সহস্র সেনা সমাগত হইলে তিনি তথায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন সিন্ধুরাজ ৫০০০০ সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। কাসীম ইহা দেখিয়া হঠাৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া একটা উচ্চ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। সিন্ধুরাজ তাঁহাকে ঐ স্থানেই আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই হস্তী উন্মত্ত ভাবে নদীনীরে পড়িল। তখন তাঁহার উপর অনবরত শরবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া হস্তী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে হত হইলেন।

সিন্ধুরাজ রণশায়ী হইলে তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিল, এবং রাজপুত্র যুদ্ধে অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণাবাদে

প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজরাণীই বংশের নাম রক্ষা করিলেন। তিনি পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণকে একত্র করিয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীম কোন প্রকারে নগর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন হিন্দুসেনাদিগের আহার দ্রব্য শেষ হইল তখন তাহাদের আর উপায় রহিল না। রাণী কি করেন নিরুপায় হইয়া অপমান ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে, অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া নগরস্থ তাবৎ নারী আপনাদের সন্তানাদি লইয়া সেই প্রকার অগ্নিতে প্রাণার্পণ করিল। অনন্তর পুরুষেরা মৃত্যু-সজ্জা করিয়া খড়্গহস্তে শত্রুকটক প্রবেশ করিয়া অসম সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে করিতে সকলে মরিল, এক প্রাণীও বাঁচিল না। দুর্গরক্ষক সেনাগণ এরূপ আচরণ করে নাই, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সদ্গতিও হয় নাই, কেননা দুর্গজয়ের পর আরবেরা তাহাদিগকে খড়্গামুখে অর্পণ এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিকে চিরবন্দী করিল।

এই ব্যাপারের পর মুলতান প্রভৃতি তাবৎ সিন্ধু-রাজ্য আরবাধীন হইল। হিন্দুগ্রন্থকারেরা লেখেন ঐ সময়ে ভারতবর্ষে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছিল, বাপ্পু-ভট্ট সিন্ধুপার অরণ্যে পলায়ন করিলেন, আজমীরের চোহনবংশীয় মহাবীর মাণিক্য রাও পরাজিত ও হত, এবং সৌরাষ্ট্র দেশীয় রাজারা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন।

এই শত্রুকে হিন্দুগ্রন্থকারেরা কেহ তস্কর, কেহ মায়াবী, কেহ ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সিন্ধুজয়ের পর কাশীম কান্যকুব্জে যাইবার মানস করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার লেখেন তিনি মিবার রাজ্যে উদয়পুর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি তথায় যাইবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। কেহ বলেন তিনি ঐ স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুবংশতিলক শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশোদ্ভব গুহপরিবারস্থ বাপা নামে এক রাজপুত্র উাঁহাকে পরাস্ত করেন।

হিজরী ৯৬ অব্দে কাশীমের মৃত্যুর পর, সিন্ধুরাজ্য ১৩২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারীর হস্তে ছিল,

খৃ ৭৫০
সং ৩৮৫২

পরে সুমেরুবাসী রজপুতেরা আরব দিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে ঐ রাজ্য হইতে দুরীকৃত করে। ঐ বিবাদের বিবরণ আমরা কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। মুসলমানেরা এতদ্দেশে আর আইসে নাই।

আরবেরা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল দেশ অধিকার করে, তন্মধ্যে মাউরুন্নহার প্রদেশের যেমন উন্নতি হইয়াছিল, আর কোন দেশের তদ্রূপ হয় নাই। ঐ রাজ্য হিন্দুকুশের উত্তর পশ্চিম খাদীন-তাতার বলিয়া খ্যাত। ইহার পশ্চিমে কাস্পিয়ান সমুদ্র,

পূর্ব্বে ইমাস পর্ব্বত, দক্ষিণে আকসস্ নদী এবং উত্তরে জাকজর্তিস নদী প্রবাহিত আছে। এই দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, তথাপি তত্রস্থ লোকেরা কৃষিকর্ম্ম বা এক স্থানে বসতি না করিয়া সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া নিরন্তর দেশে২ যুদ্ধ করিয়া বেড়াইত, একস্থানে অধিক কাল বাস করিত না, এবং যেখানে যখন থাকিত বস্ত্রাবাসে বাস এবং গো মেষের দুগ্ধে প্রাণ ধারণ করিত।

আরবদিগের একাধিপত্য-কালে এই প্রদেশস্থ লোকদের কৃষিকর্ম্ম ও রাজনীতি উত্তমরূপে শিক্ষা হইতে লাগিল। পরে তাহারা স্বীয় বাহুবলে ক্রমশঃ অনেক দেশ জয় করিয়া উত্তমরূপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে বোগ্দাদ রাজ্য হইতে এই দেশের উন্নতি, সেই বোগদাদ রাজ্য এই দেশ হইতেই উৎসন্ন হইয়াছে। তাহার কারণ বোগ্দাদ রাজ্য অতি দূরবর্ত্তী ছিল, তাহাতে এই দেশস্থ শাসনকর্ত্তারা ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইয়া, প্রথমতঃ খোরাসান, তৎপরে পারসের অন্তর্ব্বর্ত্তী বহু প্রদেশ জয় করিলেন, অবশেষে বোগ্দাদ নগরের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অধিকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোগদাদ রাজ্য ক্রমে২ অত্যন্ত হীনবল ও অকিঞ্চিৎকর হইল, এবং যে বোগ্দাদাধি

শাহের নামে তাবৎ পৃথিবী কম্পমান হইয়াছিল তিনি কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় হইয়া থাকিলেন, তাঁহার কোন ক্ষমতা রহিল না।

অনন্তর হিজরী ২৬০ অব্দে বোখারা প্রদেশের

পৃ ৮৭৩
বং ২৯৭৫

শাসনকর্ত্তা ইসমেল সামানী রাজপদবী গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় রাজ্যেশ্বর হইলেন। এই ইসমেল সামানীর বংশীয় রাজারা প্রায় একশত বৎসর উত্তমরূপে রাজ্য করিলেন। তদনন্তর ক্রমেং তাঁহাদের পরাক্রমের খর্ব্বতা হইতে লাগিল। অবশেষে (হিজরী ৩৫০ বৎসরে) তাঁহাদের উত্তরাধিকারিদিগের বিষয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তখন আবস্তগী নামে খোরাসান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজপ্রভুত্ব অমান্য করিয়া আপনি রাজা হইলেন, এবং হিমালয়শিখরস্থ বীররূপে বিখ্যাত পাঠানদিগের বাসস্থলী কাবুল ও কান্দার প্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া গজনী নগরে রাজধানী করিলেন।

আবস্তগী প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে হিজরী ৩৬৫ অব্দে আইজাক নামে তাঁহার এক পুত্র রাজা হইলেন।

পৃ ৯৭৫
বং ২০৭৭

কিন্তু তিনি দুই বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করি-

লেন, তাহাতে আবস্তগীর সৈন্যগণ তাঁহার সেনাপতি সবক্তগীকে রাজপদ প্রদান করিল। সবক্তগী আবস্তগীর ক্রীত দাস। কথিত আছে, তিনি পূর্ব্বে পারসদেশীয় রাজপরিবারস্থ ছিলেন, ঐ রাজ্য ধ্বংস হইলে এক মহাজন তাঁহাকে তথা হইতে আনিয়া আবস্তগীর স্থানে বিক্রয় করেন। আবস্তগী তাঁহাকে লালন পালন করিয়া উচ্চ পদ দিয়াছিলেন, এইরূপে তিনি ক্রমেং রাজসেনাপতি হইয়াছিলেন, তদনন্তর আবস্তগীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা জয়পাল লাহোরের অধিপতি ছিলেন। এবং উত্তরে হিন্দুকুশ অবধি পশ্চিমে লাহোর, পূর্ব্বে কাশ্মীর, ও দক্ষিণে মুলতান পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ছিল। ইহা ভিন্ন দিল্লী, কান্যকুব্জ, মিবার ও গুজরাট এই চারি বৃহৎ রাজ্যও ছিল। দিল্লীর পূর্ব্ব সীমা কালী নদী, এবং পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদী ছিল। এই রাজ্যে তুয়ার বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, ইহারা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। কান্যকুব্জের উত্তর সীমা পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কাশী, পশ্চিম সীমা বুন্দলখণ্ড, এবং দক্ষিণে মিবার। এই দেশে রথড় বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। মিবারের উত্তর আরাবল্লী পর্ব্বত, দক্ষিণে ধার প্রমার এবং পশ্চিমে গুজরাট।

এই স্থানে গুহলোটেরা রাজা ছিলেন। গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমে সিন্ধু নদী, দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও উত্তরে মরুভূমি, এখানে চালুক্য বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গদেশ ছিল, তথায় বৈদ্য বংশীয়েরা রাজা ছিলেন। অতি দক্ষিণে মধুরের রাজারা রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তৎকালে তাঞ্জোর পরিবারস্থেরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে যাদব বংশীয়েরা রাজা ছিলেন। তাহার উত্তরে খান্দেশ প্রদেশে চালুক্য বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন।

ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুরাজ্যের প্রায় বিঘ্ন ছিল না। মুসলমানদিগের বৃদ্ধি অবধি হিন্দুরাজ্যে উৎপাত আরম্ভ হইল। কিন্তু মুসলমানেরা প্রবল হইলে পরেও প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ কতক স্বচ্ছন্দ ছিলেন। পরে যখন তাঁহারা গজনীতে রাজধানী করিলেন, তখন সে স্বচ্ছন্দতা দূর হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ক্রমে২ হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া লাহোরাধিপতি জয়পাল বিবেচনা করিলেন, তাহাদিগকে দমন বা স্থানান্তর না করিলে তাহারা ক্রমে ভারতবর্ষের ভিতর আসিবে। অতএব সবক্তগী গজনীর রাজসিংহাসন আরোহণ করিলে পর, তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ

করিয়া. তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গজনী অঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

সবক্তগী জয়পালের রণোদ্যমের সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে গজনী হইতে যাত্রা করিলেন: পরে কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যবর্ত্তী লগমান* নামে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বিপক্ষসেনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয় সেনা ঐ স্থানে থাকিয়া কয়েকবার যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতে জয়াজয় ধার্য্য হইল না। পরে একটা প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হইয়া অনেক হিমশিলা পতিত হইল। হিন্দু সেনাগণের অতিশয় হিম সহ্য হইত না, তাহাতে শীতাতিশয়প্রযুক্ত তাহারা নিতান্ত কাতর হইল, তাহাতে রাজা জয়পাল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া, দণ্ডস্বরূপ কয়েক লক্ষ মুদ্রা ও ৫০টা হস্তী দেওয়া ধার্য্য করিলেন। পরে কতক টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার প্রতিভূস্বরূপ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোককে সবক্তগীর নিকট রাখিয়া আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর কার্পণ্য প্রযুক্ত হউক বা লজ্জা বশতই হউক সেই অঙ্গীকার পালন না করিয়া, সবক্তগী টাকা ও হস্তীর জন্য যে সকল লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে আটক করিয়া বলিলেন সবক্তগী প্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ না করিলে তিনি ঐ সকল লোককে মুক্ত দিবেন না। ইতিমধ্যে রাজা

জয়পাল দিল্লী, আজমীর, কলিঞ্জর ও কান্যকুব্জের রাজাদিগের নিকট পত্র লিখিলেন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ তাঁহার সহায়তা করেন।

সবক্তগী জয়পালের অভিপ্রায় জানিয়া পুনর্ব্বার রণসজ্জায় যাত্রা করিলেন। রাজা জয়পাল এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বহুসঙ্খ্যক পদাতিক সেনা ও রণমাতঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধ জয় করিতে পারিলেন না। সবক্তগী তাঁহাকে পরাজব করিয়া হিন্দুকুশ ও পেসোয়ার দেশ একবারে অধিকার করিলেন। এবং তিনি পেসোয়ার দেশ রক্ষার্থে এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ঐ সেনাপতির অধীন দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রহরী রহিল। এবং পর্ব্বতবাসী খিলিজি পাঠান জাতী-য়েরা সবক্তগীর অধীনতা স্বীকার করিল। ইহারা পূর্ব্বে ২ লাহোর দেশে সর্ব্বদা উৎপাত করিত। তাহাতে আরবদিগের আগমন অবধি লাহোর দেশের রাজারা ইহাদিগকে পর্ব্বতের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া এই ধার্য্য করিয়াছিলেন, ইহারা তথায় থাকিয়া আর কোন শত্রুকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিবে না। সুতরাং তাহারা দ্বাররক্ষকের স্বরূপ ছিল, এই জন্য কোন শত্রু ঐ পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে না পারিয়া, তৎকালে সিন্ধু দিয়া এই দেশে গমনাগমন

করিত। সবক্তগী তাহাদিগকে আপন অধীন করিয়া সেই বন্দোবস্ত ঘুচাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপারের পর সবক্তগী তাতার দেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, এজন্য জয়পালকে আনিতে পারেন নাই।

সবক্তগী অতি জ্ঞানবান ও দয়াস্বভাব ছিলেন, এবং অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় ঐহিক সুখের পরতন্ত্র ছিলেন না। কথিত আছে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে ঐ অট্টালিকা দেখাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, অট্টালিকা জলবিম্বের ন্যায়, ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী, এমন সকল দ্রব্য আদরের বস্তু নহে, যে কর্ম্ম করিলে মরণান্তেও নাম জাজ্বল্যমান থাকে তাহাই করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সবক্তগী বিংশতি বৎসর রাজ্য করিয়া, হিজরী ৩৮৭ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

খৃ ৯৯৭
কং ৪০৯৯

নবম অধ্যায়

গজনী দেশীয় রাজাদের রাজত্ব।

মহমুদ গজনবী।

সবক্তগীর মৃত্যুর পর ইস্মেল নামে তাঁহার এক পুত্র বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহমুদ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় ও যাবজ্জীবন বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আপনি সম্রাট (সলতান) নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হইলেন। মহমুদ অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তত্তুল্য বীর পুরুষ আসিয়া খণ্ডে আর কেহ রাজদণ্ড ধারণ করেন নাই।

মহমুদ অল্প বয়সে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্দেহ এই, মনুষ্যের এই জন্মের পর আর জন্ম হইবে কি না। দ্বিতীয় সন্দেহ এই যে, তিনি সবক্তগীর ঔরস-জাত পুত্র, কি আর কোন ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার এই দুই সন্দেহ অনেক দিন পর্য্যন্ত দূর হয় নাই, পরে তিনি এক স্বপ্ন দেখেন, তাহাতে উভয় সন্দেহ দূর হয়। তদবধি তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত নিবিষ্টমনা ও উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিনাশ

করিলে ঈশ্বরপ্রিয় হইবেন ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, এজন্য তিনি পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম একেবারে উন্মূলন করিবেন।

অতএব রাজসিংহাসনে উপবেশন করণানন্তর, প্রথমতঃ পশ্চিম রাজ্যের উপদ্রব নিবৃত্তি করিয়া, মহমুদ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য, সিন্ধু নদীর পারস্থ হিন্দু-রাজ্য ও দেব দেবী বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দ্বাদশ বার এই রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ যাত্রার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

প্রথম যাত্রা।—প্রথম যাত্রায় মহমুদ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া লাহোরাধিপতি জয়পালের সহিত যুদ্ধ করেন। রাজা জয়পাল সবক্তগী কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, হিজরী ৩৯১ অব্দে, (খৃ ১০০) সে অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহু-সঙ্খ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পেসোয়ারের প্রান্তরে আপন স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টায় তাহাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু জয়-লাভ করিতে পারেন নাই। মহ-মুদ রণজয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী পোনের জন নৃপতিকে বন্দী করেন। তাহাঁর পর তিনি শতদ্রু পার হইয়া বাতেণ্ডা রাজ্য লুণ্ঠন

করেন, তদনন্তর তিনি গজনীতে গিয়া রাজা জয়পালকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জয়পাল বার২ দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, ইহাতে আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করিয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিলেন। জয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল গজনী রাজ্যের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় যাত্রা।—তদনন্তর (৩৯৫ অব্দে) মহমুদ মুলতানের দক্ষিণে ভাতিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন, যেহেতু রাজা বাজীরাও তাঁহাকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করেন নাই। মহমুদ এই রাজ্য আক্রমণ করিলে বাজীরাও সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া ভাতিয়া নামক দুর্গমধ্যে থাকিলেন। দুর্গ উত্তমরূপে গড়বন্দী করা ছিল, এবং হিন্দুসেনাগণ তদ্রক্ষায় বিলক্ষণ সাহস প্রকাশ করিল, তাহাতে মুসলমান সেনাগণ অনেক দিবস পর্য্যন্ত দুর্গ জয় করিতে পারিল না। কিন্তু তৎপরে রাজার মনে কেমন একটা ভয় জন্মিল, তাহাতে তিনি দুর্গ রক্ষার্থে কতগুলিন সৈন্য রাখিয়া, আপনি সিন্ধুনদীতীরস্থ এক অরণ্যে পলায়ন করিলেন। শত্রুসেনা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাকে অরণ্যমধ্যে বেষ্টন করিল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় আপন খড়্গ দ্বারা আপনাকে

বিনাশ করিলেন। তদনন্তর যবনাধিপতি তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন পূর্ব্বক অসঙ্খ্য অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় যাত্রা।—দাওদ খাঁ নামে রাজধর্ম্মদ্বেষী পাঠানজাতীয় এক ব্যক্তি মূলতান প্রদেশের অধিপতি বাজীরাওয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা সবক্তগীর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক শপথ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার অধীনে থাকিবেন। এই অপরাধের দণ্ডের জন্য মহম্মুদ পর বৎসর সমরসজ্জা করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে রাজা অনঙ্গপাল পেশওয়ারের প্রান্তরে যাইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন। ইহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অবশেষে রাজা অনঙ্গপাল পরাস্ত হইয়া কাশ্মীরপর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। মহম্মুদ মূলতানে যাইয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। দাওদ খাঁ অপার্য্যমানে তাঁহাকে ২০০০০ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন, এবং স্বয়ং রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর তাতার দেশের রাজা ইলিক খাঁ খোরাসান লইবার মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাতে মহম্মুদ খোরাসানে যাইয়া ইলিক খাঁকে পরাস্ত করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে উদ্যত

হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত তাহা না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। মহমুদ খোরাসানে গমন কালীন মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সুখপাল নামে এক হিন্দুকে সিন্ধুপারস্থ রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন; খোরাসান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, সুখপাল মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

চতুর্থ যাত্রা।—মহমুদ খোরাসানে গমন করিলে রাজা অনঙ্গপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর কান্যকুব্জ, দিল্লী, আজমীর ও অন্যান্য রাজাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন মুসলমানদিগকে এ দেশে আর প্রবেশ করিতে দিবেন না। অতএব সকলে একত্র হইয়া যুদ্ধের তুমুল সজ্জা করিলেন। কথিত আছে এই যুদ্ধে এত সৈন্য একত্র হইয়াছিল, যে তদ্রূপ সৈন্য সঙ্কলন বহুকালাবধি দেখা যায় নাই। অনঙ্গ-

খৃ ১০০৮
কং ৪১১০ } পাল এই সেনা লইয়া, হিজরী ৩৯৯ অব্দে, সিন্ধু নদী পার হইয়া পেশাওয়ারের প্রান্তরে গমন করিলেন। মহমুদ ঐ প্রান্তরে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া আপনার সেনাগণকে গড়বন্দী করিয়া রাখিলেন।

সেনাগণ ৪০ দিবস পর্য্যন্ত গড়ের মধ্যে রহিল, একবারও বহির্গত হইল না। হিন্দু সেনারা বিলম্বে অসহন হইয়া, প্রথমেই যুদ্ধে অগ্রসর হইল এবং পর্ব্বতবাসী অতি সাহসী গোরখা জাতীয়েরা মহমুদের সেনা গণের উপর এমত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল, যে তাহাতে অনেক মুসলমানসেনা হত হইল। কিন্তু হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল, তাহাতে হিন্দুদিগের একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাহার বিবরণ এই— অনঙ্গপাল যে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই হস্তী সহসা ভয় পাইয়া রাজাকে লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল, রাজা তাহাকে কোন প্রকারে ফিরাইতে পারিলেন না। রাজা পলাইলেন এই বোধ করিয়া সেনাগণের উদ্যমভঙ্গ ও শঙ্কা উপস্থিত হইল, এবং তাহারাও রণে ভঙ্গ দিয়া শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহমুদ তাহাদের এই প্রকার ভীরু-স্বভাব দেখিয়া সসৈন্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং অন্যূন বিংশতি সহস্র সৈন্য খড়্গমুখে অর্পণ করিয়া বহু অর্থ ও বহু হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েন।

মহমুদ এই প্রকার হঠাৎ জয় লাভ করিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্ব উত্তর নগরকোঠে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান হিমালয়ের অধঃশিখরস্থ এক পর্ব্বতের উপরে, এবং

তথায় এক স্থানে মৃত্তিকা হইতে অগ্নি উঠিয়া থাকে। এজন্য এই স্থলের নাম জ্বালামুখী, এবং তাহা হিন্দু-দিগের মহাতীর্থ স্থান। পরন্তু ঐ স্থানে এক উত্তম দুর্গ ছিল, ইহাকে ভীমদুর্গ বলা যাইত, ইহার দ্বার রুদ্ধ করিলে কাহার সাধ্য ছিলনা যে তন্মধ্যে প্রবেশ করে; ইহাতে নিঃশঙ্ক বোধ করিয়া আর২ নিকটস্থ রাজগণ আপন আপন দেবালয়ের যাবতীয় ধন পুরুষানুক্রমে তথায় রাখিতেন। এই দুর্গরক্ষার্থ উপযুক্ত সেনাও থাকিত, কিন্তু পেশওয়ারেরা যুদ্ধে নিশ্চয় জয়ী হইবেন এই বিবেচনা করিয়া হিন্দু রাজগণ ঐ দুর্গ আক্রমণের আশঙ্কা না করিয়া তত্রস্থ সেনাগণকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কেবল পূজকেরা রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। অতএব যখন মহমুদ তথায় হঠাৎ উপস্থিত হইলেন, তখন পূজকেরা একেবারে দুর্গদ্বার অবারিত করিয়াদিলেন, এবং প্রাণভয়ে তাঁহার পদানত হইলেন। মহমুদ অবাধায় তাবৎ ধন গ্রহণ করিলেন। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন তিনি এই দুর্গে ৭০০০০ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা, ৭০০ মোন স্বর্ণ ও রূপার তৈজস, ২০০ মোন স্বর্ণের বাট, ২০০ মোন রূপা এবং বিংশতি মোন সতি হীরা ও আর২ বহুমূল্য প্রস্তর পাইয়াছিলেন। মহমুদ রাজধানী প্রত্যাগত হইয়া, ঐ সকল ধন গজনীবাসী লোকেরা দেখিবে বলিয়া কয়েক দিবস বাহিরে সাজা-

ইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং দরিদ্র ও ধর্ম্মব্যবসায়ী লোকদিগকে অনেক দান বিতরণ করিয়াছিলেন।

খৃ ১০১০
কং ৪১১১

ইহার পর, ৪০১ অব্দে, মহমুদ হিরাটের পূর্ব্বে গোর দেশে যাত্রা করেন। ঐ দেশে সুর বংশীয় পাঠান জাতিরা বাস করিত। মহমুদ তন্নামধারী তদ্দেশের রাজাকে পরাস্ত করিয়া ঐ দেশ জয় করিলেন।

পঞ্চম যাত্রা।—তৎপরে ঐ বৎসরেই মহমুদ ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন, এবং মুলতান প্রদেশ জয় করিয়া তদ্দেশাধ্যক্ষ আবুলফতে লোদীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ যাত্রা।—নগরকোটের দুর্গ জয় করিয়া মহমুদ হিন্দুদিগের বল বিক্রম সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহাও দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ অতি ধনাঢ্য দেশ, অতএব যে স্থলে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল তন্নিকটবর্ত্তী, প্রাচীন ও অনেক অর্থে পূর্ণ ও অভিমান্য, থানেশ্বর * নগরে যাত্রা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে মহমুদের সহিত লাহোরাধিপতি অনঙ্গপালের মিত্রতার ও সন্ধিপত্র হইয়াছিল, অতএব তিনি লাহোর প্রদেশে উপনীত হইলে, রাজা অনঙ্গপাল অতি বিনীতভাবে

* পূর্ব্বে এই স্থানকে কুরুক্ষেত্র বলা যাইত।

তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ করা আপনার যে অভিপ্রায় নগরকোটের দেবালয় ভঙ্গ করিয়া তাহা পূর্ণ হইয়াছে, অতএব থানেশ্বর গমনের আর কি প্রয়োজন, থানেশ্বরের বিগ্রহসকল হিন্দুদিগের অতিমান্য, তাহার প্রতি কোন ব্যাঘাত করিবেন না, বরঞ্চ ঐ স্থানে যে রাজস্ব সংগ্রহ হয় তাহা আপনাকে দেওয়া যাইবে। মহমুদ উত্তর করিলেন এক স্থানের ধর্ম্মালয় বিনাশ করিলে আমাদের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হইতে পারে না, আমরা এই ধর্ম্ম যত অধিক প্রচার করিব পরকালে তাহার তত পুরস্কার পাইব, অতএব আমি ভারতবর্ষহইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মূল একেবারে উচ্ছেদ করিব, তাহার কোন চিহ্ন রাখিব না। ইহা বলিয়া তিনি থানেশ্বরে যাত্রা করিলেন।

দিল্লীর রাজা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি ঐ স্থান রক্ষার্থ সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ তথায় না আসিতে আসিতে মহমুদ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পুরুষপুরুষানুক্রমে তথায় যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে গ্রহণ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি প্রায় দুই লক্ষ হিন্দুকে বন্দীবেশে লইয়া গেলেন, এবং যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া রাজমার্গে নিক্ষেপ করাইলেন, কেবল জগসূম নামে এক বৃহৎ বিগ্রহ ছিল তাহা গজনীতে লইয়া গেলেন,

এবং মুসলমানেরা তাহা সর্ব্বদা পদদ্বারা দলন করে এই জন্য তাহাতে এক মসজিদের সোপান প্রস্তুত করাইলেন।

সপ্তম ও অষ্টম যাত্রা।— ইহার পর মহমুদ দিল্লী-নগর আপন অধিকারভুক্ত করিবার মানস করিলেন, কিন্তু লাহোর প্রদেশ মধ্যবর্ত্তি থাকাতে, সে মানস সফল হওয়া কঠিন বিবেচনায়, প্রথমে লাহোর লওয়া কর্ত্তব্য হইল। কিন্তু অনঙ্গপালের কোন ত্রুটি ছিলনা, তিনি নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিতেন, এবং অতি সাবধানে চলিতেন, অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধের কোন সূত্র না পাইয়া তৎকালে দিল্লী অধিকারের দুরাশায় ক্ষান্ত ছিলেন। রাজা অনঙ্গপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়পাল লাহোরের রাজা হইলে, মহমুদ, ৪০৩ অব্দে, তাঁহার রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। জয়পাল তাঁহার ভয়ে কাশ্মীরে পলায়ন করিলেন। মহমুদ তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ স্থান লুণ্ঠন এবং তদ্দেশীয় অনেক লোককে বল পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। পর বৎসর তিনি পুনর্ব্বার ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোকোটের দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ দুর্গ জয়

করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ শীতাতিশয্যে তাঁহার অনেক সেনা নষ্ট হইল।

ইহার পর, হিজরী ৪০৭ অব্দে, মহমুদ মাউরন্নহার জয় করিলেন। এই রাজ্য বোখারার রাজাদের ছিল। মহমুদ ঐ রাজাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, এজন্য প্রথমে ঐ রাজ্যের প্রতি লোভ করেন নাই। কিন্তু যখন ঐ রাজ্যাধিপতি ইলিক খাঁ দুই জন স্বীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক হত হইলেন, তখন তিনি উজবকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বোখারা ও সমরকন্দ রাজ্য ধ্বংস এবং মাউরন্নহার প্রদেশ আপন রাজ্য-ভুক্ত করিলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার আর২ সকল কর্ম্ম হইতে গুরুতর বলিতে হইবে, কেননা ইহাতে কাস্পিয়ান সমুদ্র অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত তাবৎ স্থান তাঁহার অধীন হইল।

নবম যাত্রা।—মাউরন্নহার জয় করিয়া মহমুদের আকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হইল। অতএব তিনি, ৪০৯ অব্দে, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া কাশ্মীর দিয়া কান্যকুব্জে যাত্রা করিলেন। কান্যকুব্জ দেশ হিন্দুস্থানে অতি বিখ্যাত। এতদ্দেশীয় লোক ও মুসলমান-ইতিহাস-লেখকেরা সকলেই ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য ও ধুমধামের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখেন ঐ স্থানে এমন এমন উচ্চ মন্দির ছিল, যে তাহার চূড়া গগনস্পর্শ করিয়াছিল, এবং ঐ নগরে

এত ঐশ্বর্য্যশালী লোক বাস করিত যে তাম্বূল বিক্রয় জন্য ৩০০০০ খান দোকান এবং সংগীত-ব্যবসায়ী ৬০০০০ মনুষ্য ছিল। ইহা ভিন্ন রাজার তিন লক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও অনেক রণমাতঙ্গ ছিল। যুদ্ধকালে যখন ঐ সকল সেনা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাত্রা করিত তখন তাহারা পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় চলিত, এবং অগ্রসারী সেনাগণ আড্ডায় পৌছিলে পরেও পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদের তাম্বু ভাঙ্গা হইত না।

যৎকালে মহমুদ কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে কুঙর রায় তথাকার রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের বীরত্ব এবং তাহাদিগের দ্বারা আর২ হিন্দুরাজ্যের দুর্গতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতএব দুর্জ্জয় মুসলমানসেনাগণ তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কোন উদ্যোগ না করিয়া সপরিবারে আক্রমণকারির শরণাগত হইলেন। তাহাতে মহমুদের অন্তঃকরণে কেমন দয়া জন্মিল, তিনি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার করিলেন না। তিনি তিন দিবস মাত্র তথায় অবস্থিতি করিলেন, পরে মিরটে যাইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলেন।

তৎপরে মহমুদ কুবেরপুরীর তুল্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরীতে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান হিন্দুদিগের পুণ্য

ক্ষেত্র, এবং দেবালয়ে পরিপূর্ণ ছিল। মহমুদ পুরী প্রবেশ করিয়া মন্দির সকলের শোভা ও তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত রত্নাক্ষি ও নানা রত্নে বিভূষিত বৃহৎ বৃহৎ বিগ্রহ দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি এতাদৃশ স্বর্ণ ও রত্নরাশি কখন চক্ষেও দেখেন নাই। অতএব অবিলম্বে ঐ সকল বিগ্রহ ভগ্ন করাইয়া গলাইতে আজ্ঞা দিলেন। পরে স্বর্ণ রজত ও রত্নাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করাইয়া ভূরিং উষ্ট্র বোঝাই করিয়া আপন রাজ্যে লইয়া গেলেন। তিনি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন দেবালয় সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলি-বেন, কিন্তু ঐ সকল দেবালয়ের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে কেমন মমতা জন্মিল তাহাতে তাহা ভগ্ন করিতে পারিলেন না, কেহ কেহ লেখেন ঐ সকল মন্দিরাদি অতি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহা ভগ্ন করিতে পারেন নাই।

মথুরা জয়ের পর মহমুদ তৎসান্নিধ্যে মহাবন নগর আক্রমণ করিলেন। কুলচাঁদ নামে ঐ স্থানের রাজা ছিলেন, তিনি যুদ্ধাদি না করিয়া তাঁহার অধী-নত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাতে আর সংগ্রামাদি হইল না। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদিগের সহিত মুসলমান সেনাদের এক বিবাদ ঘটিল তাহাতে মুসলমান সেনাগণ তদ্বগরস্থ তাবৎ হিন্দুদিগকে সংহার করিল।

রাজা ইহা দেখিয়া অপমান ভয়ে, আপন স্ত্রী পুত্র গণকে বিনাশ করিয়া, আপনি আত্মহত্যা পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।

তদনন্তর মহমুদ মঞ্জনামক স্থান আক্রমণ করিলেন। তদ্দেশীয় রাজপুত সেনাগণ অতি সাহসিক রূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া, কতক সেনা প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক খড়্গহস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রুশ্রেণী প্রবেশ করিয়া অনেক সৈন্য বধ করিল, তাহার পর আপনারা মরিল। অবশিষ্ট সেনাগণ দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের উপর হইতে নীচে ঝাঁপ দিয়া, কেহ বা সপরিবারে জলন্ত চিতা আরোহণ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিল। তথাপি মুসলমান-হস্তে মৃত্যু স্বীকার করিল না।

এই প্রকার মহমুদ আর কয়েক স্থান জয় ও লুণ্ঠন করিলেন। অনন্তর স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া ভারতীয় লুণ্ঠিত ধন সর্ব্বসাধারণের দর্শনার্থ বাহিরে রাখাইলেন। তাহাতে দেখা গেল তিনি ত্রানেশ্বর হইতে যে ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, এ বারে তাহা অপেক্ষাও অধিক অর্থ আনিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পারিষদবর্গ অনেক ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, রাজা যে ধন পাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা তাহা অল্প নহে। তিনি ৫৩০০০ মনুষ্য বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু

একেবারে এত অধিক মনুষ্য আনাতে তাহার উচিত মূল্য হইল না, এক এক মনুষ্য দুই দুই টাকাতে বিক্রয় হইল। ইহার পূর্ব্বে গজনী নগরে ঘর দ্বার অধিক ছিল না, ঐ স্থান সামান্য প্রবাসী মনুষ্যের বাসস্থানের ন্যায় ছিল। অতএব যখন মহম্মদ কানাকুব্জ ও মথুরা পুরীর অপূর্ব্ব দেবালয় ও অট্টালিকা সকল দেখিলেন, তখন তাঁহারও অভিলাষ হইল ঐ স্থান অতি মনোহর অট্টালিকাতে সুশোভিত করিবেন, গজনী নগর পৃথিবীস্থ আর আর সকল নগর অপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু হইবে, এই অভিলাষে তিনি উজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত এক উৎকৃষ্ট মসজীদ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং সংগ্রামে যখন যে বহুমূল্য রত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্দ্বারা তাহা ক্রমে সুশোভিত করিলেন, সুতরাং ঐ মসজীদ অতি অপূর্ব্ব এবং ইন্দ্রপুরী বলিয়া তাবৎ আসিয়াতে বিখ্যাত হইল। রাজার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া তন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরাও বৃহৎ২ মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে গজনী সহর ক্রমে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে ভারতবর্ষে তত্তুল্য সুন্দর স্থান আর ছিল না।

দশম ও একাদশ যাত্রা।—যখন মহম্মদ নগরশোভনে এই প্রকার ব্যস্ত, তখন নন্দ নামে কালিঞ্জরের রাজা আর আর হিন্দু ভূপতিগণের সহিত পরা-

মর্শ করিলেন যে, কান্যকুব্জের রাজা মহমুদের অধীনত্ব স্বীকার করাতে হিন্দু নামে কলঙ্কপাত হইল, অতএব তাহার দণ্ড করা উচিত, এই মন্ত্রণা করিয়া সকলে কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মহমুদ এই সংবাদ পাইয়া কান্যকুব্জের রাজার সাহায্যার্থে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তিনি তথায় উপস্থিত না হইতে হইতে, নন্দ কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া তত্রস্থ ভূপতিকে সংহার করিলেন। মহমুদ বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারিয়া নন্দরাজার সহিত যুদ্ধ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। নন্দ অনেক সৈন্য একত্র করিয়া সংগ্রাম সজ্জাতে ছিলেন। কিন্তু মহমুদের আগমনে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তখন মুসলমানেরা অগ্নি ও অস্ত্র দ্বারা ঐ রাজধানী একেবারে ছারখার করিল। সেই অবধি কান্যকুব্জ নগর শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার পর পূর্ব্ব শোভা আর প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

এই যুদ্ধের পর মহমুদ লাহোর প্রদেশ একেবারে আপন রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, ঐ রাজ্যের প্রতি বহুদিবসাবধি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেননা ঐ প্রদেশ ভারতবর্ষের দ্বার স্বরূপ, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে আসিবার আর পথ ছিল না। কিন্তু লাহোরাধিপতি তাঁহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই করেন

নাই, তাহাতে তিনি ঐ রাজ্য লইতে পারেন নাই। সুতরাং ঐ রাজ্য গজনীর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও, মুসলমান রাজ্যারম্ভ অবধি ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। কিন্তু যখন মহম্মুদ কান্যকুব্জে দ্বিতীয়বার গমন করেন তখন রাজা জয়পালের কেমন কুবুদ্ধি হইল, তিনি তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন। সেই সূত্রে

খৃ ১০২৩ | মহম্মুদ, হিজরী ৪১৪ অব্দে, ঐ রাজ-
হিঃ ৪১৫ | ধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা জয়-

পাল তাঁহার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আজমীরে পলায়ন করিলেন। তদবধি লাহোর রাজ্য গজনীর অধীন হইল।

দ্বাদশ যাত্রা।—তদনন্তর মহম্মুদ বিদ্রোহ দমন জন্য তাতার রাজ্যে গমন করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি গুজরাট আক্রমণের অভিলাষ করিলেন। গুজরাট প্রদেশে সমুদ্রের তীরে সোমনাথের মন্দির ছিল। মুসলমানেরা এ পর্য্যন্ত যত মন্দির বিনাশ করিয়াছিলেন, সোমনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও উৎকৃষ্ট, এবং হিন্দুরা উহার অতিশয় সম্মান করিতেন। তাহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, সোমনাথ মর্ত্ত্যলোকে মৃত লোকের বিচার করিয়া থাকেন। সোমনাথের নিত্যসেবার জন্য হিন্দু রাজগণ অনেক অর্থ দান করিতেন, এবং ভক্তির বাহার্থ

দুই সহস্রখান গ্রাম নিয়োজিত ছিল। পাঁচ শত ক্রোশ পথ হইতে গঙ্গাজল আনাইয়া সোমনাথের নিত্য স্নান হইত। দুই সহস্র পূজারী ও তিন শত ভাণ্ডারী নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। ইহা ভিন্ন পাঁচ শত নর্ত্তকী এবং তিন শত গায়ক সংগীত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। পূজকেরা এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেন যে দিল্লী ও কান্যকুব্জে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, এজন্য ঐ রাজ্য পতন হইয়াছে, কিন্তু পুণ্যভূমি গুজরাটে পাপমাত্র নাই, অতএব অস্পর্শীয় যবনেরা এই পুণ্যভূমি স্পর্শ করিতে পারিবে না। যবনরাজ এই ভ্রান্তি দূরীকরণ জন্য অনেক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে হিজরী ৪১৫ অব্দে, মুলতান দিয়া গুজরাটে যাত্রা করিলেন।

খৃ ১০২৪
বং ৫১২৩

এই যুদ্ধে গমনার্থ মহমুদ যে সাহস করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, কেন-না গজনী হইতে গুজরাট অনেক দূর, তন্মধ্যে ১৭৫ ক্রোশ কেবল মরুভূমি, তাহাতে তৃণশস্য বা জল প্রায় নাই। ঐ দুর্গম পথ দিয়া সহজে গমনাগমন করাই কঠিন। মহমুদের সমভিব্যাহারে কত সেনা গিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু বিংশতি সহস্র উষ্ট্র তাঁহার সেনা ও অশ্বাদি পশুগণের আহারীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন অনেক সৈন্য

আপন আপন দ্রব্যাদি স্ব স্ব অশ্ব ও উষ্ট্রে লইয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু তাতার দেশীয় অনেক লোক, ধন লোভে হউক বা ধর্ম্মার্থ হউক, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই সকল লোক ও পশ্বাদি লইয়া ঐ ভয়ানক দুর্গম মরুভূমি দিয়া গমন করা কেমন কঠিন তাহা পাঠকেরা অনায়াসে অনুমান করিবেন।

মহমুদ এই দলবল সমভিব্যাহারে আজমীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তত্রস্থ রাজা প্রজা সকলে গৃহ দ্বার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাতে তিনি ঐ দেশ উৎখাত এবং নগর লুঠ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর গুজরাটের রাজধানী উপনীত হইলে তত্রস্থ ভূপতি রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। মহমুদ এই স্থান অনায়াসে লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া একেবারে সোমনাথের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। ঐ মন্দির সমুদ্রের তীরে এক দুর্গের মধ্যে, তাহা প্রায় চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত, কেবল এক দিক স্থলসংযুক্ত, সে দিকেও অতি উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীর ছিল, এবং তাহার উপর পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল।

গজনীপতি মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, হিন্দুগণ দূতদ্বারা এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন যে, মুসলমানেরা অনেক দেব দেবী নষ্ট করি-

য়াছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সোমনাথ তাহা দিগকে এখানে আসিবার সুমতি দিয়াছেন, এখানে আসিলেই তাহারা নিশ্চয় সবংশে ধ্বংস হইবে। মুসলমান সেনাগণ এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া নির্ভয়ে অতি বেগে মন্দিরাভিমুখে চলিল। হিন্দুরা তাহা দেখিয়া উগ্রোদ্যম হইয়া সজল নেত্রে সোমনাথের দোহাই দিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িল। কিন্তু সোমনাথ কি করিবেন, তিনি মুসলমানদিগকে আটক করিতে পারিলেন না। তাহাতে যখন তাহারা দেখিল মুসলমান সৈনাগণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন দৈববলে নির্ভর না করিয়া মরণ অবধারিত করিয়া, সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ঐ যুদ্ধ অতি ঘোরতর হইল। সমস্ত দিবসের মধ্যে কোন পক্ষের জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। সন্ধ্যার সময় মুসলমান সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত দিল।

পরদিবস পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতেও মুসলমানেরা জয়ী হইতে পারিল না। তৃতীয় দিবসে আরও অনেক সেনা আসিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিল, মহমুদ তাহাতেও ভীত না হইয়া রণারম্ভ করিলেন, কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা অতি সাহসী এবং সমরদক্ষ, তাহাতে তাহাদিগকে অনায়াসে পরাস্ত

করিতে পারিলেন না, ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর বাইরাম ও দেবী সলীমা নামে দুই গুজরাটী রাজা অনেক সৈন্য লইয়া হিন্দু পক্ষে সাহায্য করিতে আসিলেন, সুতরাং যুদ্ধ আরো ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন সর্ব্বজয়ী মহমুদের মনে ভয় হইল পাছে এই-বার পরাভব মানিয়া পলায়ন করিতে হয়। অতএব তিনি অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নতজানু হইয়া পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগি-লেন হে জগদীশ্বর, এইবার লজ্জা নিবারণ কর। তদ-নন্তর পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ করিয়া কটক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেনাপতিগণকে বিনীত বচনে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন তোমরা এইবার আমার লজ্জা রক্ষা কর। এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, ইহা জয় করিতে পারিলে ইহকালে যশঃ এবং পরকালে মঙ্গল হইবে, ইহাতে পরাজয় হইলে ইহকালে অযশঃ এবং পরমার্থের হানি। অতএব প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও, যদি ইহাতে মৃত্যু হয় তাহাতেও পরমার্থের কার্য্য হইবে।

এই প্রকার উৎসাহ পাইয়া সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরমেশ্বর ধন্য, এই ধ্বনি করিয়া একেবারে হিন্দুসেনার উপর পড়িল। ঐ ধাক্কায় পাঁচ সহস্র হিন্দুসৈন্য একেবারে নিহত হইল। আরও

সৈন্যগণ তাহা দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং দুর্গরক্ষক সেনাগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। মহম্মুদ অনায়াসে মন্দির প্রবেশ করিলেন। মন্দির কিবা মনোহর ও প্রশস্ত, ষট্‌পঞ্চাশৎ স্তম্ভে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত, তন্মধ্যে নানা জাতীয় রত্নে বিভূষিত বৃহৎ২ স্বর্ণময় বিগ্রহ, মধ্য স্থলে দশহস্ত পরিমাণ সোমনাথের শোভন মূর্ত্তি বিরাজমান। যবনরাজ ঐ মূর্ত্তির নিকট যাইয়া অতি ক্রোধে তাহার নাসিকাতে দণ্ডাঘাত করিয়া তাহা ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। পূজকেরা ঐ আজ্ঞায় রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া তন্নিবারণ বাঞ্ছায় অসংখ্য স্বর্ণ দিতে চাহিলেন। যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক মহম্মুদের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা পরামর্শ দিলেন ধন গ্রহণ পূর্ব্বক বিগ্রহ নাশে ক্ষান্ত হউন। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও বিগ্রহাদির প্রতি মহম্মুদের নিতান্ত দ্বেষ ছিল। তিনি মনে জানিয়া ছিলেন পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিনাশ করিলে পুণ্য স্থাপন হয়, অতএব অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রদিগকে বিগ্রহ দান করিলে, ঐ ধর্ম্মের পোষক এবং বিগ্রহবিক্রেতা বলিয়া অখ্যাতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি অর্থ অগ্রাহ্য করিয়া বিগ্রহ ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিগ্রহ ভগ্ন করিতে২ তাহার হৃদয় হইতে নানা জাতীয় মণি মুক্তা ও বহুমূল্য রত্নাদি বাহির হইয়া

পড়িল। মহমুদ তদবলোকনে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ আরং সকল মূর্ত্তি ভগ্ন করাইলেন, এবং তন্মধ্যেও অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার চিহ্নস্বরূপ সোমনাথের ভগ্ন মূর্ত্তি মক্কা, মদিনা, গজনী, ও আর আর মুসলমান প্রদেশে পাঠাইলেন।

মন্দির লুণ্ঠনকালে গুজরাটের রাজা গন্ধর্ব্ব নামে এক দুর্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, ঐ দুর্গ সমুদ্রের জলে বেষ্টিত থাকিত। ভাঁটার সময় জল কম হইলে মহমুদ ঐ স্থান আক্রমণ করিলেন, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি গুজরাটের রাজধানী অনহলপুর অধিকার করিয়া তথায় চারি মাস অবস্থিতি করিলেন।

এই যুদ্ধে মহমুদের অনেক সেনা নষ্ট এবং অপরিসীম অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও অসংখ্য অর্থ লাভ হইল। কথিত আছে এই যুদ্ধে তিনি যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অন্যান্য যুদ্ধের সমুদয় ধনাপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তিনি এই দেশ জয় করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন ঐ স্থানে রাজধানী করিবেন, অথবা ঐ প্রদেশ

আপন রাজ্যভুক্ত করিবেন। কিন্তু গজনী রাজ্য গুজরাট হইতে অনেক দূর এবং গতিবিধি আরো দুরূহ, এজন্য সে বাসনা ত্যাগ করিয়া, তত্রস্থ এক সামান্য ব্রাহ্মণকে ঐ রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার গমনের পর তদ্দেশীয় লোকেরা ঐ ব্রাহ্মণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পূর্ব্ব রাজাদিগকে আনিয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিল।

মহমুদ গমনকালে মুলতান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল। অতএব ঐ পথ দিয়া গমন না করিয়া আজমীরের পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু কতক দূর যাইয়া শুনিলেন গুজরাটের রাজা অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ পথে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি আজ-মীরের পথ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু ও মুলতানের পথ দিয়া চলিলেন। কিন্তু ঐ পথে বড় বিপদ ঘটিল, তাহার কারণ যাহারা পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল তাহা-দের একজন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বালুকা রাশি দিয়া লইয়া চলিল। ঐস্থানে তিন দিনের মধ্যে কুত্রাপি এক বিন্দু জল পাওয়া গেল না, অধিকন্তু সূর্য্যের উত্তাপে বালুকা সকল এমত উত্তপ্ত হইয়াছিল, যে তাহাতে পাদক্ষেপ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সৈন্যগণ একে পিপাসায় মৃতবৎ, তাহাতে উত্তপ্ত বালুকা ও

অগ্নিবৎ বাতাসে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, সহস্র সহস্র সৈন্য মারা পড়িতে লাগিল। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া মহমুদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পথপ্রদর্শককে আনাইয়া আজ্ঞা দিলেন বেটার কোন চাতুরী আছে ইহাকে প্রহার কর। এই আজ্ঞা পাইয়া রাজপ্রহরী-গণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন সে ব্যক্তি কহিল আমি সোমনাথের পাণ্ডা, মহমুদ সোমনাথের প্রতি অনেক অত্যাচার করিলেন এই কারণ আমি ইহাকে নরকভূমিতে আনিয়াছি। এই কথা শ্রবণ মাত্র মহমুদ তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে উত্তরভাগে একটা নূতন নক্ষত্র উদয় হইল, সেই নক্ষত্র লক্ষে তিনি গমন করিলেন, আর কোন বিপদ হইল না। কিন্তু সিন্ধু পার কালে সিন্ধুতীরস্থ জাঠ-জাতীয়েরা তাঁহার সৈন্যগণকে তাড়না করিল, এবং অনেক সৈন্য ডুবাইয়া দিল।

মহমুদ প্রাণে প্রাণে রাজধানীতে যাইয়া জাঠ-দিগের প্রতিফল জন্য লৌহশলাকা সংযুক্ত অনেক খৃ, ১০২৬ } রণতরী প্রস্তুত করাইলেন, এবং পর বৎসর (৪১৭ অব্দে) ঐ সকল তরী লইয়া তিনি তাহাদের সহিত জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে সবংশে বিনাশ করিলেন।

তৎপর বৎসর তিনি খোরাসানে যুদ্ধ করিতে গিয়া

ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। কথিত আছে তাঁহার পাথরি

খৃ. ৩০১০ কং. ৪১৩২ রোগ হইয়াছিল, সেই পাড়াতে হিজরী ৪২১ অব্দে, ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে, ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

কোন কোন গ্রন্থকার এই রাজাকে অতি উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর লেখকেরা তাঁহাকে অতি লোভী ও অন্যায়কারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার চরিত্রে দোষ গুণ উভয়ই মিশ্রিত ছিল। মহমুদ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্দ্বারা এমন বোধ হয় তাঁহার রাজ্যে ধনী দুঃখী সকলে সচ্ছন্দে বাস করে ইহা তাঁহার বাসনা ছিল, অতি দীন হীনেরাও দুঃখ জানাইলে তিনি তাহার প্রতীকার করিতেন। তাহার প্রমাণ পারস দেশে কতক গুলা দস্যু একটী স্ত্রীলোকের সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক রাজার নিকটে অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর করিলেন ঐ দেশ অনেক দূর, অতএব তথাকার উপদ্রব কি প্রকারে শান্ত করিব। স্ত্রীলোক কহিল যদি আপনি প্রজা রক্ষা করিতে না পারিলেন, তবে দেশ জয় করিবার কি ফল, রাজা হইয়া প্রজা সুখী না করিলে পর-

ঈশ্বরের স্থানে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন। রাজা মহমুদ এই কথার যথার্থ ভাবগ্রহ করিয়া ঐ দূর-দেশে দস্যুবৃত্তি নিবারণের উপায় করিলেন। কিন্তু অতি সামান্যা হইয়া ঐ স্ত্রীলোক তাঁহাকে এপ্রকার উচ্চ কথা বলিল, তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না, ইহা তাঁহার সামান্য গৌরবের কথা নহে।

তাঁহার আর একটী বিচারের কথা লেখা আছে, তাহাও অতি আশ্চর্য্য। গজনী নগরবাসী কোন সামান্য লোকের এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিল। রাজ্যের কোন পারিষদ তাহার প্রেমাসক্ত হইয়া তাহার গৃহে যাইত, এবং তাহার স্বামীকে গৃহ হইতে দূরী-কৃত করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিত। ইহাতে ঐ ব্যক্তি নিতান্ত মনঃপীড়া পাইয়া রাজার স্থানে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, যখন ঐ ব্যক্তি তোমার গৃহে পুন-র্ব্বার আসিবে তখন তুমি আসিয়া আমাকে সংবাদ দিও। ইহার এক দিবস পরে ঐ ব্যক্তি আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল, সে ব্যক্তি আসিয়াছে। মহ-মুদ তখনি স্বীয় শরীররক্ষক কয়েক জন সৈন্য সমভি-ব্যাহারে তাহার সঙ্গে গমন করিলেন, এবং তাহার গৃহে উপনীত হইয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দীপ নির্ব্বাণ করিলে তিনি স্বয়ং খড়্গ

কক্ষে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ পাপাত্মাকে স্বহস্তে সংহার করিলেন। তদনন্তর আলোক আনাইয়া সংস্থিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, নতজানু হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য ঐ দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি কে তাহা তিনি অগ্রে জানিতে পারেন নাই, মনে মনে আশঙ্কা ছিল, স্বগণ বা আত্মীয় হইলে তাহাকে কিরূপে সংহার করিব এজন্য আলোক নির্বাণ করিতে বলিয়াছিলেন। অতঃপর যখন দেখিলেন সে ব্যক্তি আত্মীয় নহে, তখন সে ভাবনা দূর হইলে পর পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, স্বগণের শোণিত দর্শন করিতে হইল না। কোন২ গ্রন্থে ইহাও লেখে মহম্মুদ এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া অবধি জলগ্রহণ করেন নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ঐ পরদারহারীর প্রাণদণ্ড না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না, অতএব তাহাকে সংহার করিয়া জলগ্রহণ করিলেন।

মহম্মুদের এবম্ভূত গুণে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। ধনী ও নির্ধনী সকলেই নিরুদ্বেগে থাকিত। লোকেরা বলিত তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগে এক ঘাটে জল পান করে। কিন্তু যেস্থলে তিনি স্বয়ং অর্থ গ্রহণের বাঞ্ছা করিতেন সেস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ন্যায়ান্যায়ের বিবেচনা করিতেন না। একদিন

আর উর্জিলার পুরে এক ধনবন্ত মুসলমান ছিল, মহমুদ তাঁহাকে অধার্ম্মিক হিন্দু-মতাবলম্বী বলিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইবার আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিল ধর্ম্মবিষয়ে আমি সঙ্কুচিত-শালী বটি, কিন্তু স্বৌত্তলিক বা স্বধর্ম্মত্যাগী নহি, যদি আমার ধন হরণ করা আপনার বাঞ্ছা হয় তবে তাহা করুন, কিন্তু অধার্ম্মিক অপবাদ দিয়া আমার যশঃ হরণ করিবেন না। এই কথা বলাতেও অর্থলোভী ভূপতি তাহার অর্থ হরণ করিলেন। কিন্তু তাহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে এক সুখ্যাতি-পত্র দিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে ঔৎসুক্যই মহমুদের সকল কর্ম্মের মূল ছিল। মুসলমান-ধর্ম্মপুস্তকে লেখে কেবল ঐ ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের মুক্তির কামনা সিদ্ধি হইতে পারে, অতএব ঐ ধর্ম্ম প্রবল করণার্থ খড়্গ ধারণ করিবে। মহমুদ এই ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিতেন, এবং হিন্দুধর্ম্ম বিনাশে প্রতিষ্ঠা আছে ইহাও বোধ করিতেন। কিন্তু তদ্রূপ-লক্ষে রাজ্য এ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। কারণ তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি আজ্ঞা দিলেন মদীয় স্বোপার্জ্জিত যাবতীয় অর্থ, রত্ন, হয়, হস্তী আমার সম্মুখে আনয়ন কর, মরিবার পূর্ব্বে আমি তাহা অবলোকন করিব। এই আজ্ঞাক্রমে তাঁহার

ভৃত্যগণ রাজ-ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ রজত মণি মুক্তা তাবৎ তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ঢেরী করিল। মহমুদ তাহা দেখিয়া আক্ষেপ করিলেন আমার এত ধন, আমি ইহা আর ভোগ করিতে পারিব না। তদনন্তর তিনি কিঙ্করগণকে আজ্ঞা দিলেন ধন সকল পুনর্ব্বার ভাণ্ডারে লইয়া রাখ, কাহাকে এক কপর্দ্দকও দান করিতে পারিলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে তিনি লোভের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেন, ধর্ম্মপরায়ণতা নাম মাত্র।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে মহমুদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি রাজধানীতে এক মাদ্রাসা করিয়াছিলেন তাহাতে নানা প্রকার ভাষা শিক্ষা হইত এবং ছাত্রদিগের বৃত্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইত। তদ্ভিন্ন যখন মহমুদের যশঃ-সূর্য্য গগণ উদ্দীপন করিলেন তখন গজনী নগরে অনেকানেক কবি ও বিদ্বান লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনি তাঁহাদিগের বৃত্তি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ফের্দৌসী নামে যে বিখ্যাত কবি শাহনামা গ্রন্থ রচনা করেন এবং আসিয়া খণ্ডের দ্বিতীয় কবি বলিয়া বিখ্যাত, তিনি তাঁহার এক জন সভাসদ ছিলেন। কিন্তু মহমুদ তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তুমি রাজনীতি বর্ণনা

কর, তাহাতে যত কবিতা রচনা করিবে প্রতি কবিতাতে এক এক স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব। ফর্দোস্তুশী এই আশাতে ত্রিশ বৎসর সংপরোনাস্তি শ্রম করিয়া পুস্তক রচনা করিলেন ঐ পুস্তক ৬০০০০ কবিতা ছিল, কিন্তু মহমুদ তাঁহাকে ৬০০০০ স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া ৬০০০০ রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাহিলেন। কবিবর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সভা পরিত্যাগ করিলেন। মহমুদ তাঁহাকে পুনরানয়ন করিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর আসিলেন না, ব্যঙ্গ করিয়া এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহার ভাব এই —গজনীর রাজসভা রত্নাকর বটে, কিন্তু ঐ রত্নাকর অতলস্পর্শ এবং কূলরহিত আমি রত্ন পেতে তাহাতে জাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার লোতই সার হইল, রত্নাদি কিছুই লাভ হইল না। মহমুদ এই কবিতায় ক্রুদ্ধ না হইয়া মনে মনে ভাবিলেন ফর্দোস্তুশীর যে ধন পাইবার আশা ছিল তাহা পান নাই, এজন্য আমার নিন্দা করিয়াছেন, যদি তিনি ইচ্ছামত ধন পান তবে পুনর্বার আমার প্রশংসা করিবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে ৬০০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যে দিবস রাজভৃত্যেরা ঐ মুদ্রা লইয়া পৌঁছিল সেই দিবস ফর্দোস্তুশী পরলোক গমন করিলেন। অতএব এই

অর্থ তাঁহার কন্যাকে দেওয়া হয়, তিনি তাহা লইয়া একটা দিঘী খনন করান।

আনসরী নামে আর এক কবি রাজসভাতে ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত কবিতা-শক্তি ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে চারিশত পণ্ডিতের অধ্যক্ষ করিয়া, আজ্ঞা দিয়াছিলেন কেহ কোন পুস্তক প্রস্তুত করিলে তিনি অগ্রে দেখিবেন, পুস্তক তাঁহার মনোনীত হইলে, তিনি তাহা রাজাকে দেখাইবেন, নতুবা দেখাইবেন না। বোগদাদ রাজার প্রেরিত আবুরিহান নামে তর্ক ও জ্ঞান শাস্ত্র ব্যবসায়ী আর এক পণ্ডিত রাজসভাতে ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রে এমত বিচক্ষণ যে, আবিসিনার তুল্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু কেবল জ্যোতিষ বিদ্যার জন্যই তাঁহার অধিক গৌরব হইয়াছিল।

মস্যুদ।

মহম্মদের দুই পুত্র ছিলেন, মস্যুদ ও মহম্মদ। মস্যুদ অত্যন্ত বলবান ও বীর ছিলেন। কথিত আছে অতি বলবান পুরুষেরা তাঁহার হস্তের দণ্ড দুই হস্তে উত্তোলন করিতে পারিত না, এবং তিনি তীর ক্ষেপণ করিলে হস্তীর শরীর ভেদ হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন, এজন্য মহম্মদ

তাঁহাকে অতিদূরবর্ত্তী ইস্পাহান দেশের রাজত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদকে আপন রাজত্ব দিবার মানসে নিকটে রাখিয়াছিলেন। অতএব

খৃ ১০৩০
হি ৪২১

মহম্মুদের মৃত্যু হইলে পর, ৪২১ অব্দে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি অতি ধীরস্বভাব ছিলেন, সুতরাং তৎকালে যে সকল যুদ্ধাদি উপস্থিত ছিল তাহা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলেন, এজন্য রাজসেনাগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মসুদের পক্ষাবলম্বী হইল। মসুদ ইস্পাহান হইতে আসিয়া, ভ্রাতাকে পদচ্যুত ও অন্ধ করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করিলেন। মহম্মুদ অন্ধ কারারুদ্ধ থাকিলেন।

মসুদ রাজ্য গ্রহণ করণানন্তর দুই বৎসর পর্য্যন্ত পারস্য দেশের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিলেন, এজন্য ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। তৎপরে ৪২৪ অব্দে, তিনি কাশ্মীর যাত্রা করিয়া সরস্বতীর দুর্গ জয় করিলেন। ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলে পর তদ্রক্ষক সেনাগণ ভীত হইয়া তাঁহাকে অনেক টাকা ভেট ও বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইল। মসুদ তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি মুসলমান মহাজন ঐ দুর্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তাঁহারা ঐ সময়ে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে আমরা এখানে

বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলাম, অত্রস্থ শাসনকর্ত্তা আমাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এই সংবাদে মসুদ অত্যন্ত রাগ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আরো শুনিলেন যে, ঐ দুর্গরক্ষক সৈনাগণের আহার দ্রব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহারা অধিক কাল যুদ্ধ করিতে পারে না। অতএব তিনি ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, এবং নিকটস্থ ক্ষেত্রের ইক্ষুর দ্বারা খেয় পূর্ণ করিয়া, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গ প্রবেশ করিয়া দুর্গরক্ষক তাবৎ সেনা সংহার করিলেন। তদনন্তর দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া মুসলমান মহাজন সকলকে দুর্গলুণ্ঠিত তাবৎ ধন প্রদান করিলেন। ইহাতে দেশ বিদেশে তাঁহার অত্যন্ত সম্মান ও যশোবৃদ্ধি হইল।

৪২। অব্দে মসুদ শিবালিক পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া হাঁসির দুর্গ জয় করেন এবং তাহাতে অসঙ্খ্য অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী প্রাপ্ত হন। তদনন্তর দিল্লীর বিংশতি ক্রোশ ব্যবধানে সনপত নামক হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থানে গমন করেন। তত্রস্থ লোকেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি করিতে ইচ্ছা করে নাই, তথাপি তিনি তথাকার তাবৎ দেবালয় ও বিগ্রহ চূর্ণ করিলেন। তৎপরে তিনি লাহোরে যাত্রা করিয়া আপনার পুত্র মজদুদকে তথাকার অধ্যক্ষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

তদনন্তর সেলজক্‌দিগের সহিত একটা যুদ্ধ হইল। সেলজক জাতীয়েরা তাতার রাজবংশোদ্ভব, পূর্ব্বে গজনীর অধীন ছিল, পরে ক্রমশঃ দলবদ্ধ ও প্রবল হইয়া খোরাসান প্রদেশ আক্রমণ করিল। মসুদ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে আর ২ অনেক স্থানে যুদ্ধানল প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার সেনাগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তিনি ঐ বিরোধ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সেনাগণ মহাস্পর্দ্ধা যুক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিল, এবং তাঁহার সহোদর মহমুদকে পুনর্ব্বার রাজত্ব দিল। মহমুদ অন্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য আপনি রাজত্ব না করিয়া আপনার পুত্র আহমুদকে রাজ্যার্পণ করিলেন। আহমুদ রাজা হইয়া মসুদকে,

খৃ ১০৪১ } ৪৩৩ অব্দে, নষ্ট করিলেন। মসুদ
কং ৪১৪৩ } ১০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং

যদিও অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন, তথাপি বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগ করিতেন।

মহুদ।

মসুদের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র মহুদ হিন্দুকুশের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। মসুদের মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র

তখন প্রজারা তাঁহাকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। অনন্তর তিনি গজনী আসিয়া বিপক্ষগণকে সংহার পূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। ঐ সময়ে সেলজকেরা আরো প্রবল হইয়াছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ তোগ্রলবেগ স্বয়ং এক দল সৈন্য লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া বোগ্দাদ, পশ্চিম পারস, ও রুম রাজ্য আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন; আর এক দল সেনা হিরাট সিস্তান ও গোর প্রদেশ জয় করিয়া গজনীর রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। মহুদ তোগ্রলবেগের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেলজুকদিগের দৌরাত্ম্য কতক নিবারণ করিলেন, কিন্তু আরং অনেক যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন।

এই অবসরে দিল্লীশ্বর ভারতবর্ষকে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পঞ্জাবের রাজাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। এবং সকলের উৎসাহ জন্য তিনি এই কথা রাষ্ট্র করিলেন যে, মুসলমানেরা নগরকোটে যে বিগ্রহের মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াছিল, ঐ বিগ্রহ তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়াছেন, তিনি পুনর্ব্বার আপন মন্দিরে আসিয়াছেন, রাজা সসৈন্যে সেইখানে গমন করিলে তিনি তাঁহার সহায়তা করিয়া মুসলমানদিগকে একবারে নিপাত করিবেন। এই কথা শুনিয়া অনেক লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইল।

দিল্লীশ্বর ঐ সকল সৈন্য লইয়া নগরকোটে যাত্রা করিলেন। গমনকালে ত্রাণেশ্বর, হাঁসি, ও আর আর কয়েক স্থান জয় করিলেন। তদনন্তর নগরকোটে উপস্থিত হইয়া তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গরক্ষক মুসলমান সৈন্যগণ অতি সাহসিক রূপে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাতে দিল্লীশ্বর হঠাৎ কিছু করিতে না পারিয়া, চারি মাস পর্য্যন্ত তাহা বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। দুর্গে যে পর্য্যন্ত আহার দ্রব্য ছিল সে পর্য্যন্ত তত্রস্থ সেনাগণ উন্মত্তভাবে রহিল। আহার দ্রব্য শেষ হইলে নত হইয়া রাজার শরণাগত হইল। রাজা দুর্গ প্রবেশ করিয়া প্রকাশ করিলেন, যে, যে বিগ্রহের মূর্ত্তি মুসলমানেরা পূর্ব্বে ভগ্ন করিয়াছিল, সেই বিগ্রহ পুনর্ব্বার আপন মন্দিরে আসিয়া বিরাজিত হইয়াছেন। রাজা ঐ বিগ্রহের এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রিযোগে সেই মূর্ত্তি মন্দিরে রাখাইয়া, পরদিবস প্রাতে ঐ বিগ্রহ সকলকে দেখাইলেন। ভক্তগণ দেবতাকে জাগ্রৎ ভাবিয়া ভক্তিরসে আর্দ্র হইল, এবং দেশ বিদেশে লোকেরা রাজার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমেই তাঁহার দল বল আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং অসংখ্য লোক তাঁহার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে চলিল। এই সুযোগে দিল্লীশ্বর,

সিন্ধুর পূর্ব্বভাগে মুসলমানেরা যত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন প্রায় সকলই পুনর্ব্বর্জন করিলেন। কেবল লাহোর প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে রহিল।

খ্রিঃ ৭৬১ } মসুদ পরলোক গমন করিলে পর, খৃ ১০৫১ } আবলহোসন নামে তাঁহার এক বং ৪১৩৩ } ভ্রাতা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনিও আপন পিতৃব্য আবল রসিদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। এই আবল রসিদ এক বৎসর রাজত্ব করিলে পর, তোগ্রুল নামে এক প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে এবং রাজপরিবারস্থ আর ২ সকলকে সংহার করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিলেন, কিন্তু চল্লিশ দিবস না যাইতে২ তিনিও হত হইলেন। তদনন্তর ফরোখজাদ নামে সবক্তগীন পরিবারস্থ এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি প্রথমে সেলজুখদিগকে পরাজয় করিলেন। কিন্তু পরে তাহারা আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

এব্রাহেম।

এব্রাহেম ফরোখজাদের সহোদর। ফরোখজাদের খৃ ১০৫৭ } মৃত্যুর পর, তিনি, ৫২১ অব্দে, বং ৪১২১ } রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। এব্রাহেম অতি-

ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি ২২ বৎসর সেলজুখ দিগের আক্রমণে অত্যন্ত অস্থির ছিলেন, তাহার পর তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। পরে, ৪৭২ অব্দে, তিনি অনেক সৈন্য সঙ্কলন পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে আসিয়া মহারণ্য সমীপবর্ত্তী আজুদিন নগর লুণ্ঠন করিলেন। তৎপরে বিখ্যাত রূপালের দুর্গ জয় করিয়া তথা হইতে এক লক্ষ মনুষ্য বন্দীবেশে গজনী দেশে লইয়া গেলেন।

খৃ ১০৯৮ } এব্রাহেম ৪০ বৎসর উত্তম রূপে রাজত্ব
হিং ৪৯২ } করিয়া, ৪৯২ অব্দে, লোকান্তর গত হয়েন।

তাঁহার ৩০ পুত্র এবং ৩৬ কন্যা ছিল।

দ্বিতীয় মসুদ।

মসুদ এব্রাহেমের পুত্র। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রাচীন ব্যবস্থাদি সংশোধন পূর্ব্বক অনেক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল। পরন্তু তিনি সেলজুখদিগের রাজা সিঞ্জরের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে ঐ জাতীয়দের সঙ্গে তাঁহার পিতা যে সন্ধি করেন তাহা আরো দৃঢ়-তর হইল। এই রাজার রাজত্বকালে তুগ্রালবেগ নামে তাঁহার সেনাপতি হিন্দুস্থানে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গা পার হইয়া কয়েক দেশ জয় করেন। তাহার

খৃ০ ১১১৫ | হি০ ৫০৯ } পর আর সংগ্রামাদি হয় নাই। মসুদ ৫০৯ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

অরসিলা।

অরসিলা মসুদের পুত্র। তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই আপন সহোদরগণকে কারারুদ্ধ করেন। এই অপ্রিয় কর্ম্মে তিনি সকলের অত্যন্ত ঘৃণিত হন। পরে তিনি আপন পিতৃব্য বহরামকে কারাগারে রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহরাম পূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া গজনী হইতে পলায়ন করিয়া সিঞ্জরের শরণাগত হইলেন। সিঞ্জর তাঁহার সহায় হইয়া সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। অরসিলা এই সংবাদ পাইয়া সিঞ্জরের সন্তোষার্থ দুই লক্ষ মুদ্রা উপহার সমভিব্যাহারে স্বীয় গর্ভধারিণীকে তাঁহার সদনে প্রেরণ করিলেন। উঁহার অভিপ্রায়, তন্মাতা স্বীয় ভ্রাতাকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করান। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহার অত্যাচার এবং তৎ কর্ত্তৃক আপনার আর২ সন্তানগণের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এজন্য ভ্রাতাকে যুদ্ধে ক্ষান্ত না করিয়া প্রত্যুত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সিঞ্জর সমর সজ্জা করিয়া গজনী যাত্রা করিলেন।

অরসিলা ত্রিশ সহস্র অশ্বারূঢ় ও অনেক পদাতিক ও ১৩০ টা সমরমাতঙ্গ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাগণ রণে পরাঙ্মুখ হইল। তাহাতে তিনি সংগ্রাম করিতে অক্ষম হইয়া হিন্দুস্থানে পলায়ন করিলেন। সিঞ্জর গজনীতে বহরামকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

খৃ ১১১৭
হিং ৫১১

৫১১ অব্দে অরসিলা রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হইয়া অবশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন।

বহরাম।

বহরাম সাহসী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি বিদ্বান লোকের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিতেন, এবং বিদ্বান লোকের গৌরব ও পুরস্কার করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে অনেক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং সেখ নিজামী নামক এক বিখ্যাত কবি তাঁহার সভা পণ্ডিত ছিলেন। বহরাম বহুগুণসম্পন্ন এবং ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু একটী কর্ম্মে তাঁহার মহিমাতে কলঙ্কপাত হইয়াছে। তদ্বিবরণ এই—সসুদ, রাজা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গোর দেশ আপন করস্থ করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ দেশ গজনীর অধীন ছিল, ঐ

দেশের রাজা কুতবুদ্দীন মহম্মদ বহরামের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত বিরোধ হওয়াতে বহরাম তাঁহাকে বধ করেন, ঐ আক্রোশে তদনুজ সিফলউদ্দীন অনেক সৈন্য লইয়া গজনী আক্রমণ করিলেন। বহরাম তাঁহার সহিত যুদ্ধে অক্ষম হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানে পলায়ন করিলেন। সিফলউদ্দীন নগর অধিকার করিয়া ঐ স্থানে থাকিলেন, এবং বহরামের প্রত্যাগমনের আশঙ্কা না থাকাতে, গোর হইতে তাঁহার সঙ্গে যে সকল সৈন্য আনিয়াছিল তাহার অধিকাংশ তদনুজ আলাউদ্দীনের সমভিব্যাহারে গোরে গমন করিল। কিন্তু গজনীবাসী লোকেরা তাঁহার আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, অতএব সেই বৎসর হিমাতিশয়ে গোর হইতে গজনীতে গমনাগমনের পথ ঘাট বন্ধ হইলে, তাহারা, বহরামকে আহ্বান করিল। বহরাম সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা সিফলউদ্দীনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। সিফলউদ্দীনের প্রতি বহরামের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ছিল, অতএব তাঁহাকে পাইয়া তিনি তাঁহার মুখে মসী লেপন করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া সমস্ত নগর ফিরাইলেন, তাহার পরে তাঁহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া সংহার করিলেন, এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক সিঞ্জরের সমীপে পাঠাইলেন।

আলাউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া একেবারে জলদগ্নি হইলেন, এবং গোর জাতীয় পর্ব্বতবাসী মহাবল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে অগ্নির ন্যায় গজনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহরাম অনেক সেনা লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পর্ব্বত-বাসী গোর সেনাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লাহোরে পলাইলেন। আলাউদ্দীন গজনী নগর প্রবেশ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, গজনীবাসী এক প্রাণী-কেও রাখিবে না, আর নগর সমভূম করিয়া ফেলিবে। ইহাতে দুর্দান্ত সেনাগণ অবিশ্রান্ত সাত দিবস উন্ম-ত্তের ন্যায় গজনীবাসীদিগকে সংহার করিতে লাগিল, এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও দগ্ধ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিল। অষ্টম দিবসে ঐ নগরের কিছু চিহ্নও রহিল না। যে সকল অট্টালিকা বহু যত্নে প্রস্তুত ও রত্নে মণ্ডিত হইয়া-ছিল, তাহা ইষ্টক-রাশি হইল, কেবল কয়েকটা কবর-স্থান ভাঙ্গা যায় নাই, তাহাই নগরের চিহ্ন স্বরূপ রহিল। আলাউদ্দীন এই প্রকার নগর নাশ করিয়া গোরে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর মুসলমান রাজারা এই স্থানে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাহা শ্মশান ভূমির ন্যায় হইয়াছিল। বহরাম গজনী হইতে পলায়ন করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যাদি সমভিব্যা-হারে লাহোরে থাকিলেন, এবং নানা তাপে বেষ্টিত

সিঞ্জর, গোর ও গজনী উভয় রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। তদনন্তর তিনি তাঁহাকে ঐ রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। পরে খোরজম দেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তুর্ক বংশীয় ইউজ নামক এক অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হন। তাহাতে ঐ জাতীয়েরা কিছুকাল গোর ও গজনী উভয় রাজ্য অধিকার করে। পরে চীনের উত্তরঅঞ্চলবাসী খতান নামধারী আর এক অসভ্য জাতীয়েরা আসিয়া সেলজুখ ও ইউজ উভয় জাতিকে ঐ প্রদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়, তাহাতে সেলজুখেরা প্রায় একেবারে নিপাতিত হয়। অনন্তর ঐ খতান জাতীয়েরা কিছুকাল গজনী অধিকার করিয়া, তথা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করে, তাহাতে গোরের রাজারা ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই গোলযোগের সময় আলাউদ্দীন গোরী পরলোক গমন করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর, ৫৫২ অব্দে, সৈয়ফউদ্দীন গোরী নামে তাঁহার এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক বৎসর মাত্র রাজ্য করিয়া যুদ্ধে হত হন।

গাওয়াসউদ্দীন গোরী।

সৈয়ফউদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র গওয়াসউদ্দীন রাজ্যপ্রাপ্ত হন। গওয়াসউদ্দীন শাক-

স্বভাব এবং যুদ্ধে অনিপুণ ছিলেন, এজন্য তিনি স্বীয় অনুজ সাহেব উদ্দীন মহম্মদ গোরীকে সেনাপতি করিলেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া রাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। মহম্মদের পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য ছিল, অতএব পশ্চিমাঞ্চল সুস্থির হইলে পর, তিনি (৫৭২ অব্দে) ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়া, যে স্থানে পঞ্জাবীয় পঞ্চ নদী সিন্ধু নদীতে পড়িয়াছে, সেই স্থানে অচ নামক স্থান জয় করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে, (৫৭৪ অব্দে) তিনি গুজরাটে গমন করিলেন। তৎকালে ভীমদেব ঐ দেশের নৃপতি ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুসেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন, তাহাতে মুসলমান সেনাপতি জয় লাভে বঞ্চিত হইয়া বহুক্লেশে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে তিনি দুইবার লাহোর যাত্রা করিয়া গজনীরাজবংশীয় খসরু রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। তাহাতেও তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, বরং পরাজিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুরাজ্যে যাত্রা করেন, এবং সমুদ্র-পর্য্যন্ত ঐ দেশ উৎখাত করেন। তদনন্তর, ৫৮২ অব্দে, তিনি পুনর্ব্বার লাহোরে যাত্রা করেন, এবং কৌশল দ্বারা খসরু রাজাকে আপন হস্তগত

খৃঃ ১১৮৬ }
কং ৪২৮৮ }

করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সপরিবারে বিনাশ করেন।

খসরুকে পরাজয় করিলে পর, মহম্মদের আর মুসলমান শত্রু রহিল না, কেবল হিন্দু শত্রু রহিল। হিন্দু সেনাগণ মুসলমান সেনার ন্যায় সমরদক্ষ ছিল না, তাহাতে মহম্মদ গোরী অনায়াসে জয় লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুত জাতীয়েরা নিতান্ত বীর্য্যহীন ছিল না, তাহারা যুদ্ধ কর্ম্মে অত্যন্ত পারগ, এবং সহজে নত হয় নাই।

ঐ সময়ে যে সকল হিন্দুরাজা ছিল, তাহার মধ্যে দিল্লী, আজমীর, কান্যকুব্জ ও গুজরাট এই চারিটী প্রধান, এই কয়েক দেশের রাজারা এক গোষ্ঠী ছিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে, দিল্লীর রাজার পুত্র না হওয়াতে, তিনি আপন দৌহিত্র আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে দিল্লী ও আজমীর এক হইয়াছিল। কিন্তু কান্যকুব্জের রাজাও দিল্লীরাজের দৌহিত্র ছিলেন, দিল্লীশ্বর তাঁহার অগৌরব করিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সাহেবউদ্দীন মহম্মদ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বোধ করিয়া ৫৮৭ অব্দে, খৃ ১১৯১, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধারম্ভ করি-

লেন। পৃথ্বীরাজ অন্যান্য রাজাদের সপক্ষতায় দুই লক্ষ সেনা ও তিন সহস্র রণমাতঙ্গ লইয়া থানেশ্বর হইতে সাত ক্রোশ দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ ব্যবধানে সরস্বতী নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মুসলমান সেনাগণের সহিত সন্দর্শন হইয়া রণসজ্জা হইতে লাগিল।

খৃ ১১৯১
কং ৪২৯৩

মুসলমানদিগের যুদ্ধের এইরূপ নিয়ম ছিল, প্রথমে অশ্বারোহী এক এক দল সেনা অগ্রসর হইয়া শরক্ষেপ করিত, তাহার পরে, হয় অগ্রেই বল করিয়া যাইত, নতুবা পাশ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিত, তখন পশ্চাতে সৈন্যেরা সেই প্রকার অগ্রসর হইত। হিন্দুদিগের সংগ্রামের প্রথা সেরূপ ছিল না, ইহাদের সম্মুখের সেনাগণ আক্রমণ করিলে পশ্চাতের সেনাগণ দুই দিক হইতে চক্রাকারে যাইয়া শত্রুকে বেষ্টন করিত। উপস্থিত যুদ্ধে মুসলমান সেনাগণ আক্রমণ করিলে হিন্দুসৈন্যেরা সেই প্রকার বেষ্টন করিতে গেল। মহম্মদ বেষ্টিত প্রায় হইয়া অশ্বারোহণে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং পৃথ্বীরাজকে স্বহস্তে বর্শার আঘাত করিলেন। পৃথ্বীরাজ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাতির উপর হইতে তাঁহাকে এমন শরাঘাত করিলেন যে তাহাতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন। কিন্তু ঐ বিপদকালে তাঁহার এক বিশ্বাসী কিঙ্কর তদারোহিত অশ্বে

লম্ফদিয়া উঠিয়া তাঁহাকে রণস্থল হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেল। ইহাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সংগ্রাম রক্ষা হইল না, যে হেতু তাঁহার সেনাগণ তাঁহার পলায়ন দৃষ্টে রণে ভঙ্গ দিয়া শ্রেণীভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কোন প্রকারে স্থির হইলনা। হিন্দুসেনাগণ তাহাদিগকে কাটিতে ২ বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইল, এবং অনেক সৈন্য নষ্ট করিল।

এই বিভ্রাটের পর মহম্মদ গোরী লাহোরে যাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার ভগ্ন সৈন্য একত্র হইলে, তিনি

হি ৫৮৮ খৃ ১১৯২ } গোরে প্রত্যাগমন করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে ঐ পরাজয়ে তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, এবং গোরে যাইয়া অবধি এক দিনও সুখে নিদ্রা যান নাই। তাঁহার নিতান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল হিন্দু রাজাদিগকে পরাজয় করিবেন। অতএব তিনি যুদ্ধপারগ অসুরতুল্য অতি দুর্দান্ত তুর্ক, তাজিক ও পাঠান সেনা আহরণ করিলেন। এই সকল সেনার মধ্যে কেবল অশ্বারোহী ১২০০০০ ছিল, তাহাদের পোলাতের পোষাক, এবং মস্তকের টুপী বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত। ইহা ভিন্ন পদাতিক সৈন্যও অনেক ছিল। ঐ সৈন্য লইয়া মহম্মদ মস্

সমারোহ পূর্ব্বক প্রথমতঃ গজনী যাত্রা করিলেন। তথা হইতে লাহোর যাইয়া হিন্দু রাজাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আমি তোমাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিব।

দিল্লীশ্বর এই সংবাদ পাইয়া তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী, ও বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, সেনাগণ তাম্র তুলসী স্পর্শ করিয়া শপথ করিল, যুদ্ধ জয় করিব নতুবা প্রাণ ধারণ করিব না। এই সকল সেনাগণ সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইল, মহম্মদের সৈন্যগণ তাহার পরপারে ছাউনি করিল। মহম্মদ দেখিলেন হিন্দুসৈন্য অসংখ্য, পৃথ্বীরাজ মুসলমান সেনাপতিকে আত্মীয়ভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তুমি আপন জীবনকে ভার বোধ করিয়া থাক, তবে যুদ্ধ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সেনাগণকে কেন অকালে কালগ্রাসে নিক্ষেপ করিবে। যদি ইহাতে কল্যাণ বাঞ্ছা কর তবে এখনও স্বদেশে প্রতিগমন কর, নতুবা রজনী প্রভাত হইলে আমাদের রণমত্ত মাতঙ্গ, দিগ্বিজয়ী তুরঙ্গ, ও শোণিতপায়ী সৈন্যগণ তোমার সকল দল বল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একবারে রসাতলে দিবে। মহম্মদ উত্তর করিলেন আমি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাতে সংগ্রামে আসিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন প্রতিগমন করিতে পারি

না। কিন্তু তাঁহাকে পত্র লিখিতেছি যে পর্য্যন্ত তথা হইতে প্রত্যুত্তর না আইসে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব না। হিন্দুগণ এই কথায় ভুলিয়া এক প্রকার স্বচ্ছন্দ হইল; এবং রজনীযোগে নানাপ্রকার আনন্দ-কার্য্যে মত্ত হইল।

মহম্মদ সতর্ক থাকিয়া সেই রাত্রেই নদী পার হইয়া অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং অনেক সেনা কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। হিন্দুরাজা-দিগের এত অধিক সৈন্য ছিল, যে এক দিক পরিষ্কার না করিতে২ আর দিগের সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইল। তখন মুসলমান সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া যুদ্ধপারগ উত্তম২ সৈন্যগণকে স্বতন্ত্র রাখিলেন, অবশিষ্ট কতক গুলিন অশ্বারোহী সেনা লইয়া, কখন যুদ্ধ করিবার আকারে এক কালীন অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কখন বা পলায়ন ছলে হটিয়া যাইতে লাগিলেন। হিন্দুসেনাগণ তাহাদের পশ্চাৎ২ যাইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইল, তখন মহম্মদ স্বতন্ত্র রক্ষিত সবল অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে একেবারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সেনাগণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হিন্দুসৈন্যের শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া অবিশ্রান্ত সংহার করিতে লাগিল।

ইহাতে অনেক হিন্দু রাজা হত এবং পৃথ্বীরাজ রণবন্দী হইলেন, হিন্দুসেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। তাঁহাদের যাবতীয় দ্রব্যাদি পড়িয়া রহিল, মহম্মদ ঐ সকল দ্রব্যাদি এবং অসংখ্য অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তিনি আজমীরে যাইয়া ঐ দেশ অধিকার এবং পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি সহস্র ২ মনুষ্যের প্রাণ বধ করিলেন। অবশিষ্ট সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ঐ সময় পৃথ্বীরাজের পুত্র গোলা তাঁহার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক করস্বরূপ অনেক অর্থ দিলেন। তাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে আজমীর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদনন্তর মহম্মদ দিল্লী রাজ্য লুণ্ঠন করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ রাজপুত্র তাঁহাকে অনেক অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিয়া ক্ষান্ত করাইলেন। এই ব্যাপারের পর মহম্মদ স্বীয় বিশ্বাসপাত্র কুতবকে ভারতবর্ষে রাখিয়া, পথে যত দেশ পাইলেন তাবৎ লুঠ ও নষ্ট করিতে ২ গজনী প্রত্যাগমন করিলেন।

মহম্মদের প্রত্যাগমনের পর, ৫৮৯ অব্দে, কুতবউদ্দীন

খৃ ১১৯৩ }
সং ১২৫০ }

রাজপুত্রকে পরাজয় করিয়া দিল্লী রাজ্য লইলেন, এবং তথা হইতে গিয়া যাত্রা করিয়া ঐ স্থানে রাজধানী করিলেন।

তৎপরে গঙ্গা যমুনার অন্তঃপাতি কোল নামক দুর্গ অধিকার করিলেন।

পর বৎসর মহম্মদ পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিয়া যমুনার উত্তরে ইটওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে গমন করিলেন। ঐ স্থানে কান্যকুব্জের ভূপতি জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন, কিন্তু কুতবউদ্দীনের সেনাগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তাহাতে কান্যকুব্জ মুসলমানদিগের রাজ্য ভুক্ত হইল, এবং ঐ দেশের অধিকাংশ লোকেরা কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া মাড়ওয়াড়ে বসতি করিল। তৎপরে মহম্মদ বারাণসী (কাশী) গমন করিলেন, এবং ঐ বিখ্যাত তীর্থ স্থান জয় করিয়া তত্রস্থ তাবৎ দেব দেবী ও মন্দির চূর্ণ করিলেন। এই স্থান জয় করাতে মুসলমানদিগের বেহার পর্য্যন্ত অধিকার হইল, এবং বঙ্গ দেশ জয়েরও সূত্রপাত হইল। তাহার পর কুতবউদ্দীনকে প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষে রাখিয়া তিনি গজনীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহম্মদের প্রত্যাগমনের পরে হেমরাজ নামে পৃথ্বীরাজের এক কুটুম্ব তৎপুত্র গোলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কুতবউদ্দীন আজমীরে যাত্রা এবং হেমরাজকে পরাস্ত করিয়া গোলাকে তদ্রাজ্যে পুনঃস্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি গুজরাটে যাত্রা করিলেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে (১১৭৮ অব্দে)

রাজা ভীমদেব মুসলমান সেনাদিগকে পরাজয় করাতে তাঁহার মনোমধ্যে যে আক্রোশ ছিল সেই আক্রোশে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ঐ দেশ লণ্ড ভণ্ড করিলেন।

৫৯৯ অব্দে মহম্মদ পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে যাত্রা করিয়া আগ্রার পশ্চিমে বায়েনার দুর্গ জয় করিলেন। তদনন্তর তিনি গোয়ালিয়র রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইত্যোমধ্যে খোরাসানে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, সুতরাং তাঁহাকে গজনীতে ফিরিয়া যাইতে হইল। কুতব-উদ্দীন ভারতবর্ষে থাকিয়া গোয়ালিয়রের যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, এবং অনেক ক্লেশের পর ঐ যুদ্ধ জয় করিলেন। তৎপরে আজমীরের রাজাদিগের মধ্যে পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে তিনি ঐ স্থানে যাইয়া তাহা নিবারণ করিলেন। কিছুকাল পরে আজমীর নগরের রাজারা সর নামক আজমীরের নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী লোকদিগের সহায়তায় ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কুতবউদ্দীন এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়া আজমীরের দুর্গে বদ্ধ হইয়া থাকিলেন, যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর গজনী হইতে সৈন্য আগত হইলে, তিনি ঐ সৈন্য-সহকারে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। তৎপরে তিনি গুজরাটে যাত্রা করিয়া ঐ প্রদেশ উৎখাত করণানন্তর দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। পর বৎসর তিনি বুন্দলখণ্ডে

কালিঞ্জর ও কপীল নামে দুই দুর্গ অধিকার, এবং তৎপরে রোহিল খণ্ডে যাত্রা করেন।

ইহার পূর্ব্বাবধি মুসলমানেরা গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে মহম্মদ বক্তার খিলিজী অযোধ্যা ও উত্তর বেহার জয় করিয়া কুতব-উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনন্তর তিনি বেহারের অবশিষ্টাংশ ও বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ-দেশের রাজধানী গৌড়দেশ অধিকার করেন।

মহম্মদ খোরাসানে যাত্রা করিয়া খরজমের রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গএয়াসউদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এপর্য্যন্ত তিনি জ্যেষ্ঠের সেনাপতি হইয়া কর্ম্ম করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, ৫৯৯ অব্দে তিনি গোরের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরী।

মহম্মদ রাজা হইয়া খরজমের রাজার সহিত যুদ্ধ করণার্থ পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সময়ে এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, তিনি সংগ্রামে হত হইয়াছেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে নানা

গোল উপস্থিত হইল, এবং গজনীবাসী লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে নগর প্রবেশ করিতে দিল না। পরন্তু এলদাজ নামে তাঁহার পালিত ক্রীত দাস তাঁহার সহিত বিপক্ষতা আরম্ভ করিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর এক জন প্রধান সেনাপতি মুলতানে যাইয়া তদ্দেশ অধিকার করিল, এবং গোরখা জাতীয়েরা লাহোর অধিকার করিয়া পঞ্জাব দেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। মহম্মদ এই দুঃসময়ে পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ মুলতান তৎপরে গজনা অধিকার করিলেন। তদনন্তর কুতবউদ্দীনের সহায়তায় পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ঐ দেশ পুনর্ব্বার জয় এবং গোরখাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। তদনন্তর ৬০২

খৃ ১২০৩
বং ৪৩০৮

অব্দে, লাহোর হইতে গজনী যাত্রা করিয়া এক দিবস সিন্ধুতীরে ছাউনি করিয়া, রাত্রে অতিশয় গ্রীষ্ম প্রযুক্ত তাম্বুর কানাত খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গোরখা জাতীয়েরা তাঁহার পরম শত্রু ছিল, এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদা ফিরিত, অতএব ঐ রাত্রে তাহাদিগের মধ্যে বিংশতি জন খণ্ডা গোপনভাবে তাঁহার সৈন্য-কটক প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ প্রহরীগণকে সংহার করিল। তৎপরে তাম্বুর মধ্যে যাইয়া একেবারে সকলে তাঁহাকে

অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। সাহেবউদ্দীন্ মহম্মদ্ প্রাণত্যাগ করিলেন।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরী সর্ব্ব শুদ্ধ ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি প্রথমতঃ ভ্রাতার সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং রাজা হন। মহম্মদ অতি বীর পুরুষ, এবং মহমুদ গজনবী অপেক্ষাও অনেক দেশ জয় ও অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহমুদ গজনবী যেমন দূরদর্শী, বিচক্ষণ, ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। বরঞ্চ অতি নিষ্ঠুর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অতএব মহমুদ গজনবীর ন্যায় ইহাঁর নাম বিখ্যাত নহে।

মহম্মদের মৃত্যুকালে মালব ও অন্যকতিপয় কয়েক দেশ ভিন্ন বারাণসী পর্য্যন্ত তাবৎ হিন্দুস্থানে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল। এবং সিন্ধু ও বঙ্গদেশ অধিকার হইতেছিল। গুজরাট প্রদেশও পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ স্থানে তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। আর ২ স্থানে, কোথাও তাঁহারা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেন, কোথাও বা হিন্দু রাজারা তাঁহাদিগকে কর দিয়া আপনারা রাজত্ব করিতেন।

মহম্মদ গোরী।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরীর পুত্রাদি ছিল না,

অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ রাজা হইলেন। কিন্তু সাহেবউদ্দীন মহম্মদ কতক গুলীন তুরকী বালক পালন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা ক্রমেং উচ্চ পদস্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের, ইলদাজ গজনীর, এবং নসিরউদ্দীন সিন্ধু ও মুলতানের, শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সাহেবউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর ইহাঁরা স্ব স্ব প্রধান ও স্বাধীন হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না, সুতরাং তিনি গোর, হিরাট, সিস্তান ও খোরাসানের পশ্চিমাংশ লইয়া থাকিলেন। আরং সকল স্থান স্বাধীন হইল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুতবউদ্দীন প্রবল ছিলেন, এজন্য মহম্মদ তাঁহার সৌহৃদ্য আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজপদ প্রদান করিলেন। ইলদাজ ও নসিরউদ্দীন তাদৃক প্রবল ছিলেন না, তথাপি মহম্মদ তাঁহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। ঐ বিবাদ নিবৃত্তি না হইতে হইতে খরজম দেশীয় রাজা তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়া গজনী ও গোর প্রভৃতি সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থ তাবদ্দেশ অধিকার করিলেন। তাহাতে গোর রাজ্য একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়

দিল্লীতে পাঠান বা আফগান দিগের রাজ্যারম্ভ।

কুতবউদ্দীন।

সাহেবউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ, কুতবউদ্দীনকে ভারতবর্ষের রাজ্যভার অর্পণ করিলে, হিজরী ৬০০ অব্দে, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাজ্য হইল।

খৃ ১২০৬
কই ৪৩০৮

কুতবউদ্দীন এই রাজ্যের স্রষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন, কিন্তু তিনি ক্রীত দাস ছিলেন, ইহাতেই ইতিহাসে একটা অপবাদ রহিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সৎকুলোদ্ভব নহেন।

কুতবউদ্দীনের পূর্ব্ব বিবরণ এই—তিনি তুর্কস্থানের এক সামান্য মনুষ্যের পুত্র ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকে কোন মহাজন ক্রয় করিয়া নিশাপুরে এক ভদ্র মনুষ্যের স্থানে বিক্রয় করেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষা করান। পরে তাঁহার মৃত্যু

হইলে পর, তাঁহার বিত্তাদি বিক্রয়কালে এক জন দাস-বিক্রেতা কুতবকে ক্রয় করিয়া সাহেবউদ্দীন মহম্মদ গোরীর স্থানে বিক্রয় করে। মহম্মদ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ ভৃত্যস্বরূপ রাখিয়াছিলেন; তৎপরে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ করেন। অনন্তর যখন খরজম দেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ হয়, ঐ সময়ে সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্য আনয়নার্থ কুতব অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধিক সম্মান হয়। তৎপরে সরস্বতী নদীর তীরে হিন্দু রাজাদিগের সহিত যুদ্ধের পর, দিল্লী ও আজমীর জয় হইলে, মহম্মদ গোরী তাঁহাকে ভারতবর্ষস্থ সেনার অধিপতি করেন। তদবধি কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তত্রস্থ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, এবং মধ্যে ২ অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর, তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করেন। সেই অবধি দিল্লী নগর মুসলমান রাজাদের রাজধানী হয়।

কুতবউদ্দীন রাজা হইলে পর, ইলদাজ ভারতবর্ষকে গজনীর অধীন বলিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং লাহোর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কুতবউদ্দীন তাঁহাকে তথা হইতে

দূরীকরণ পূর্ব্বক গজনী পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন। কিয়ৎকাল পরে ইলদাজ তাঁহাকে ঐ রাজ্য হইতে পুনর্ব্বার দূরীকরণ করেন। তদবধি কুতবউদ্দীন আপন রাজ্যে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, আর কোন যুদ্ধে গমন করেন নাই।

কুতবউদ্দীন অতিশয় ন্যায়পরায়ণ এবং দাতা ছিলেন, এবং ঐ গুণে সকলের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর রাজকর্ম্ম সম্পাদন করণানন্তর, ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া, হিজরী ৬০৭ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

খৃ. ১২১০
হিং ৬০৭

আরাম।

কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আরাম রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন যোগ্যতা ছিল না, তাহাতে এক বৎসর অতীত না হইতে হইতে তিনি আলতমাস কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন।

সমস্থদ্দীন আলতমাস।

আলতমাস, মহম্মদ গোরীর আর এক ক্রীত দাস, তিনি, কুতবউদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বেহার দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পরে কুতবউদ্দীনের

মৃত্যুর পর তিনি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরামের সহিত সংগ্রাম করিয়া দিল্লীরাজ্য অধিকার করিলেন।

ঐ সময়ে ইলদাজ গজনীর অধিপতি ছিলেন। আলতমাস রাজা হইলে তিনি দিল্লীকে আপন অধীন জ্ঞান করিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে রাজসনন্দ প্রেরণ করিলেন। তৎপরেই ভারতবর্ষ লইবার মানসে সংগ্রামসজ্জা করিয়া আসিলেন, কিন্তু আলতমাস তাঁহাকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিলেন।

তদনন্তর নসিরউদ্দীন সিন্ধুদেশে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন, তাহাতে আলতমাস তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিলেন না।

এই বিবাদের সময়ে খরজম রাজা ভারতবর্ষ জয় করিবার অভিলাষে যুদ্ধসজ্জা করিয়া সিন্ধু নদীর নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। নসিরউদ্দীন তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে (হিজরী ৬১৮) জঙ্গিস খাঁ নামে এক মোগল সেনাপতি তাতার দেশ জয় করিয়া অসংখ্য মোগল-সেনা লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় মুসলমান রাজ্যে আসিলেন, তাহাতে সকলে অন্ধকার দেখিল। জঙ্গিস খাঁয়ের সঙ্গে এত

সৈন্য আসিল, যে তাহার পূর্ব্বে বা পরে তত সৈন্য কখন একত্র দেখাযায় নাই, এবং ঐ সকল সৈন্যেরা যেপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, পৃথিবী সৃষ্টি হইয়া অবধি তেমন দৌরাত্ম্য আর কখনই হয় নাই। ঐ মোগলেরা কোন ধর্ম্ম চালাইবে কিম্বা অর্থ গ্রহণ করিবে এমত অভিলাষ ছিল না, কিন্তু মার আর কাট ইহা তাহাদের শব্দ ছিল, এবং তাহারা যে সকল দেশ দিয়া গমনাগমন করিল তাহা একেবারে উৎসন্ন হইল।

এই মোগলেরা প্রথমে খরজম রাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহার কারণ, জঙ্গিস খাঁ, খরজম-রাজার সমীপে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে বধ করেন। ইহাতে মোগলেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার তাবৎ সেনা ছিন্ন ভিন্ন, তাঁহার তাবৎ রাজ্য উচ্ছিন্ন, এবং তাঁহার তাবৎ প্রজা সংহার ও বন্দী করিল। খরজমের রাজা জঙ্গিস খাঁয়ের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দেশত্যাগী হইলেন। এবং তাঁহার পুত্র জলালউদ্দীন রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে পলায়ন করিলেন। কিছুকাল পরে এই রাজপুত্র প্রাণ পণ করিয়া ঐ মোগলদিগের সহিত একবার কান্ধারে ও আর একবার সিন্ধুতীরে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে

মোগলেরা তাঁহাকে পরাজয় করিল। তাহাতে তিনি সিন্ধুপার হইয়া দিল্লীরাজ্যে আলতমাসের শরণাগত হইলেন। আলতমাস বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সহায়তা করিলেন না; কেননা তাহা হইলে মোগলেরা তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিত। জলালউদ্দীন ঐ আশায় নিরাশ হইয়া গোরখাদিগের সহিত মিলিয়া সিন্ধুনদীপারস্থ তাবদ্দেশ নষ্ট এবং তৎপরে সিন্ধুরাজ্য জয় করিলেন। তদনন্তর মোগলেরা পারস দেশ হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি ঐ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে হত হইলেন।

এই মোগলেরা যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যখন জলালউদ্দীন সিন্ধু রাজ্যে ছিলেন, তখন মোগলেরা তাঁহার অন্বেষণে মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু নগর প্রবেশ করিতে না পারিয়া সিন্ধুমুখে গমন করিল। এই সময়ে তাহাদের পাথেয় হ্রাস হইয়াছিল, তাহাতে সম্প্রতিব্যাহারী বন্দীগণকে আহার দিবার সঙ্গতি হইবেনা বলিয়া ১০০০০০ এক লক্ষ বন্দীকে খড়্গমুখে অর্পণ করিল। কি নিষ্ঠুরতা, যদি এই সকল লোককে আহার দিবার ক্ষমতা ছিল না তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সে ভাবনা থাকিত না, তাহা না করিয়া তাহা-

দিগকে সংহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল। এই প্রকার তাহারা আর আর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছিল।

মোগলেরা প্রস্থান করিলে পর আলতমাস, (৬২২ অব্দে) নসিরউদ্দীনের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। এ যাত্রায় নসিরউদ্দীন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন, এবং সিন্ধু নদী পার কালে তন্মধ্যে সপরিবারে জলমগ্ন হইলেন, তাহাতে সমুদায় সিন্ধু রাজ্য দিল্লীর অধীন হইল।

সে বৎসর বক্তার খিলিজী বেহার ও বঙ্গদেশ আপনার উপার্জ্জিত বলিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। ইহার প্রতীকার জন্য আলতমাস সসৈন্য বেহার যাত্রা করিলেন, এবং বেহার প্রদেশ তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া আপনার পুত্রকে অর্পণ করিলেন। বঙ্গদেশ বক্তার খিলিজীর হস্তে রহিল, তিনি অঙ্গীকার করিলেন দিল্লীর রাজার অধীন থাকিয়া ঐ দেশ শাসন করিবেন। কিন্তু পরে তাহা না করিয়া ঐ দেশ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অবশেষে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর আলতমাস ছয় বৎসর হিন্দুস্থানের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া প্রথমতঃ রিন্তাম্বর, তাহার পর মালব

প্রদেশে মাণ্ডুভিনগর ও উজ্জয়িনী নগর জয় করিলেন। মধ্যে গোয়ালিয়র রাজ্যে রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা শান্তি করিয়া তিনি ঐ দেশ পুনরধিকার করিলেন।

এই প্রকার, মধ্যে ২ দুই এক দেশ ভিন্ন, প্রায় তাবৎ হিন্দুস্থান জয় হইল, তন্মধ্যে কোন দেশ নিতান্ত শাসনাধীন, কোন দেশ বা কতক শাসিত হইল, এবং মোগলদিগের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য ঐ অবস্থায় ছিল। তবে কখন কখন শাসনকর্ত্তাদিগের অনবধানতা দোষে কোন কোন প্রদেশে হিন্দু রাজারা মস্তকোত্তোলন অর্থাৎ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সম্রাট শক্ত হইলে তাহা করিতে পারিতেন না।

আলতমাস এই সকল দেশ জয় করিয়া, ৬৩৩ অব্দে,

| খৃ ১২৩৬
ক্রঃ ৩৩৩৮ |

দিল্লী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে মুলতানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল।

কুতব-মিনার নামে দিল্লীতে এক জয়স্তম্ভ আছে, তাহা আলতমাসের রাজত্বকালে সমাপন হয়। ঐ স্তম্ভের কিয়দংশ ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইয়াও এখন পর্য্যন্ত তাহা ১৬০ হাত উচ্চ আছে। এত উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীতে আর কোন স্থানে

দেখা যায় না * । কুতবউদ্দীন, সাহেবউদ্দীন মহম্মদের স্মরণার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

রুকনুদ্দীন।

আলতমাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দীন, ৬৩৩ অব্দে, সম্রাট হন। তিনি অতি লম্পট ছিলেন, এবং বেশ্যা ও নর্ত্তকীতে প্রায় তাবৎ ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছিলেন। তিনি অহরহঃ এই ভাবে থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার গর্ভ-ধারিণী রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। কিন্তু তিনিও অতি নিষ্ঠুরা ছিলেন, এবং প্রজাগণকে নানাপ্রকার পীড়ন করিতেন, তাহাতে প্রজাসকল অস্থির হইয়া, সাত মাস পরে, রুকনুদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহার সহোদরা রেজিয়াকে রাজ্য সমর্পণ করিল।

খৃ ১২৩৬
হি ৬৩৩

---

* ইহার উপস্তম্ভ ৩০ হাতের ন্যূন নহে এবং উপরিভাগের পরিধি অন্যূন ২০ হস্ত। এই স্তম্ভ ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রথম ১২০ হস্ত কঙ্করময় লোহিত প্রস্তরে, ঊর্দ্ধভাগ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার বাহিরে চারিটী বারান্দা আছে, প্রথম বারান্দা ৬০ হস্তের উপর, দ্বিতীয় ৯৪, তৃতীয় ১২০ হস্তের উপর এবং চতুর্থ ১৩৫ হস্তের উপর। স্তম্ভের ভিতর দিয়া যে চক্রাকার আবর্ত্তনশীল সোপান তদ্দ্বারা এই সকল বারান্দাতে গমন করা যায়। সোপান চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং অতি সুন্দর। এই স্তম্ভ কুতবের নির্ম্মিত বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন, এই স্তম্ভ প্রথমতঃ হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় তৎপরে মুসলমানেরা তাহাকে রূপান্তর করেন।

রেজিয়া বিগম।

ফেরেস্তা লিখিয়াছেন রেজিয়া সমস্ত রাজগুণ-

খৃ ১২৩৬ }
কং ৪৩৩৮ }

বিশিষ্টা ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার দোষানুসন্ধান করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার একমাত্র এই দোষ পাইয়াছিলেন, যে তিনি নারী জাতি, তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোন দোষ ছিল না। রেজিয়া বিদ্যাবতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি কোরান পুস্তকখানি অতি সুন্দররূপে পাঠ করিতে পারিতেন, এবং রাজকর্ম্মে এমন বিচক্ষণা ছিলেন যে, তাঁহার পিতা হিন্দুস্থানে গমনকালে কোন পুত্রের প্রতি রাজকর্ম্মের আরোপণ না করিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। রেজিয়াও ঐ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অনন্তর যখন রাজ্যের মহৎ মহৎ লোকেরা তাঁহার ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করেন, তখন তাঁহাদের দুইটা দল হইয়াছিল। এক দলের অভিপ্রায় যে রেজিয়া রাজরাণী না হন, বাদীন মন্ত্রী এই দলের অধিপতি ছিলেন। তিনি অনেক লোক একত্র করিয়াছিলেন, এবং অনেক সৈন্য একত্র করিলেও করিতে পারিতেন, তাহা হইলে রেজিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তি দুরূহ হইত। কিন্তু তিনি এমন কৌশল করিলেন যে সৈন্য দ্বারা যে কার্য্য না হয় তাহা ঐ কৌশল দ্বারা হইল। তিনি শত্রু-

গণের মনোভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আপনারাই পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল, সুতরাং তাহাদের মন্ত্রণা বিফল হইল, এবং রেজিয়া অনায়াসে সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

রেজিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিতেন, রাজসভায় আসিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, এবং তাবৎ বিষয় আপনি নিষ্পত্তি করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি পূর্ব্বতন রাজনীতি সংশোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক জন ক্রীত দাসকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে সকল সভাসদের প্রধান করিয়া আমিরল ওমরা খ্যাতি দিয়াছিলেন, ইহাতে সকল সভাস্থেরা অপমান বোধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন। আলতাগিন নামে তুর্কজাতীয় এক প্রধান ব্যক্তি এই বিদ্রোহের মূল ছিলেন। রেজিয়া বিদ্রোহ নিবারণ জন্য স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে বিপক্ষগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহোদর বহরামকে রাজা করেন। রেজিয়া বন্দী হইয়াও বিপক্ষ দলপতিকে প্রণয় ও রাজ্যের প্রলোভ প্রদর্শন করিয়া এমন বশীভূত করিলেন, যে তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে উভয়েই হত হই-

লেন। রেজিয়া তিন বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ময়জুদ্দীন বহরাম।

খৃ ১২৪০
কং ৪৩৪১

হিজরী ৬৩৭ অব্দে, বহরাম রাজা হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহার সহায়কারী সভাসদ্‌গণের প্রাণ লইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক সম্প্রদায় মোগল সৈন্য লাহোর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তাহাতে সে অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। পরে যুদ্ধের সময়ে তাঁহার আপনার সৈন্যগণ কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। বহরাম দুই বৎসর দুই মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন মস্থদ।

খৃ ১২৪২
কং ৪৩৪৩

বহরামের মৃত্যুর পর, ৬৩৯ অব্দে, রুকনুদ্দীনের পুত্র মস্থদ রাজা হইলেন। কিন্তু তিনিও পিতার ন্যায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া থাকিতেন। তাহাতে তিনি দুই বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল রাজত্ব করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও হত হইলেন।

* মস্থদের রাজত্ব কালে মোগল সৈন্যেরা দুই বার

রাজ্য আক্রমণ করে। প্রথমবার তাহারা কেবল ত্রিবর্ত্ত দিয়া বোগদাদে গমন করে, দ্বিতীয় বার রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অচ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

নসিরউদ্দীন মহম্মদ।

নসিরউদ্দীন মহম্মদ, আলতমাসের পুত্র। আলতমাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নী তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহম্মদ কারারুদ্ধ থাকিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, এবং কোরান পুস্তক নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন, তাহাতে তাঁহার দিনপাত হইত। এই প্রকার কিছুকাল যাপন করিলে পর তিনি এক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন, ঐ কর্ম্ম তিনি অতি বিচক্ষণতা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করেন।

খৃ. ১২৪৩ }
হিজ. ৬৪৪ } তাহার পর, হিজরী, ৬৪৪ অব্দে, দিল্লীর রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইলেন, তাহার কারণ, বিদ্যা অনুশীলন ও প্রজাপালনে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, এবং রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া যাহাতে তাহা রক্ষা হয় তাহারই যত্ন করিতেন। কিন্তু এত বড় রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তিনি যেপ্রকার সামান্য ভাবে থাকিতেন, তাহা শুনিলে হাস্য আইসে। পূর্ব্বে

কারাগারে থাকিয়া যেমন পুস্তক লিখিয়া দিনপাত করিতেন, দিল্লীশ্বর হইয়াও সেই প্রকার পুস্তক বিক্রয় করিয়া যতঃকথঞ্চিৎরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজ্যের রাজস্ব রাজ্যের কর্ম্মেই ব্যয় হইত, তাহার এক কপর্দ্দকও আপনার কর্ম্মে ব্যয় করিতেন না। আর এমন ভোগসামগ্রী সত্ত্বেও তিনি যোগীর ন্যায় থাকিতেন, তাঁহার রাজরাণী স্বহস্তে তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিতেন। রাণী এক দিন রন্ধন করিতে হস্ত দগ্ধ করিয়া তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন, রন্ধন কর্ম্মের জন্য আমাকে এক জন পরিচারিণী দিতে আজ্ঞা হউক। রাজা তাহাও দেন নাই। রাণী একাকিনী সকল গৃহকর্ম্ম করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার এমত শীলতা ছিল যে, মনুষ্যের সেরূপ প্রায় হয় না। কোন সময়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়া এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দেখাইলেন। সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া একটী কথা অশুদ্ধ বলিয়া তাহা সংশোধন করিতে বলিলেন। মহম্মদ তাঁহার কথায় সেই কথাটি সংশোধন করিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করিলে সেই কথাটি উঠাইয়া আপনার কথাটি পুনর্ব্বার লিখিয়া রাখিলেন। কোন ব্যক্তি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি উত্তর করিলেন এই কথা শুদ্ধ লেখা ছিল। কিন্তু তাহা না কাটিলে পাছে ঐ ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন,

এজন্য তাহা কাটিয়াছিলাম, বাস্তবিক ঐ কথা শুদ্ধ নহে, এজন্য তাহা পুনর্ব্বার সংশোধন করিয়া রাখিলাম। এই প্রকার তাঁহার আর আর অনেক গুণ ছিল।

মহম্মদের পূর্ব্বে যে দুই তিন জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজকর্ম্মে অমনোযোগ ও আলস্য প্রযুক্ত নিকটস্থ কয়েক হিন্দু রাজা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ তাঁহাদিগকে দমন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যে আপনার আধিপত্য পুনঃস্থাপন এবং দিল্লী অবধি চম্বল নদী পর্য্যন্ত মেওয়াত দেশ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অধিকন্তু গোরখা জাতীয়েরা একবার মোগলদিগের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার রাজ্যে উৎপাত করিয়াছিল, এজন্য তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া শাসন করিলেন। তদ্ভিন্ন মোগল সৈন্যেরা পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বদা উপদ্রব করিত, তাহা নিবারণ জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে সেরখাঁ নামে এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তি তথায় থাকিয়া কেবল মোগলদিগের উৎপাত নিবারণ করিতেন এমত নহে, তিনি তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া গজনী রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার তাঁহার রাজত্বকালে সকল রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত হইয়াছিল, কিন্তু বালীন নামে তাঁহার

যে মন্ত্রী ছিলেন তিনিই ইহার মূলাধার। বালীন পূর্ব্বে আলতমাসের ক্রীত দাস ছিলেন, পরে স্বীয় গুণে তাঁহার প্রিয় হইয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহম্মদ ঐ মন্ত্রীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীও ঐ সকল কর্ম্মে যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বালীন।

খৃ ১২৬৬ }
কং ৪৩৬৮ }

বালীন, পূর্ব্ব রাজত্ব অবধি মন্ত্রিকর্ম্ম করিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও পরাক্রমশালী ছিলেন, অতএব মহম্মদের মৃত্যুর পর তিনি অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিলেন। আলতমাস রাজার প্রতিপালিত তাঁহার মন্ত্রী আর২ যে সকল ক্রীত দাস উচ্চপদস্থ হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করিয়াছিলেন যদি কোন প্রকারে রাজ্য অধিকার করিতে পারি তাহা হইলে আপনারা রাজ্য বিভাগ করিয়া লইব। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া, ছলে বলে তাঁহাদিগের কাহাকে বিনাশ করিলেন, কাহাকেও অপমানগ্রস্ত করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর তিনি অতি সুমখাতে রাজ্য আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে২ বুঝিয়াছিলেন ধনধান্য ব্যতীত লোকে সম্মান করে না, অত-

এর ধুমধামের একশেষ করিলেন। বিশেষ, ঐ সময়ে মোগলদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার সভাতে আসিয়াছিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে বোগদাদাধিপতির দুই পুত্র ছিলেন। বালীন তাঁহাদিগকে সম্মানে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন সিংহাসনে উপবেশন করিতেন তখন তাঁহাদিগকে আপনার সম্মুখে সারি দিয়া বসাইতেন, এবং সেনের অন্য রাজা তাঁহার অধীনে প্রতিপালিত হইতেছেন ইহাও গর্ব্ব করিয়া বলিতেন।

এই সকল রাজাদের সমভিব্যাহারে অনেক বিদ্বান মনুষ্য দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তাহাতে এই কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তিনি বিদ্বান্‌পালক, কিন্তু সে কথা অকিঞ্চিৎকর। মাহম্মদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন, তিনি অতি বিচক্ষণ এবং ঐ সকল বিদ্বান লোকদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিতেন। এবং পারস্য দেশীয় সেখ সাদী নামক বিখ্যাত কবিকে আপন সভাতে আনয়ন করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাদী বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত আসিতে না পারিয়া তাঁহাকে আপনার কৃত কয়েকখান গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। খসরু নামে বিখ্যাত কবি এই রাজকুমারের সভাতে থাকিতেন।

বালীন, মহৎলোক ব্যতীত নীচ লোক বা সামান্য

লোককে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কোন কর্ম্ম দিতেন না, এবং পূর্ব্বাবধি হিন্দুদিগকে উচ্চ কর্ম্ম দেওনের যে রীতি ছিল তাহা রহিত করিয়াছিলেন। আর সকল কর্ম্মেই তাঁহার অতিশয় শাসন ছিল। কোন স্থানে রাজবিদ্রোহ হইলে পূর্ব্ব রাজাদিগের রাজত্ব কালে এই রীতি ছিল প্রধান নায়কে দণ্ড দান পূর্ব্বক শাসন করিয়া দেওয়া যাইত, তাহারা এমত কর্ম্ম আর না করে। কিন্তু বলীনের সময়ে ঐ প্রকার বিদ্রোহ হইলে ছোট বড় সকলকেই খড়্গ-মুখে অর্পণ করা যাইত, বরঞ্চ ইহাও শুনা যায় যদি কখন কোন দেশের শাসনকর্ত্তা কোন ত্রুটি করিতেন তাহা হইলে নিদারুণ প্রহারে তাঁহার প্রাণ নাশ করাইতেন।

এই প্রকার শাসন থাকাতে রাজবিদ্রোহাদি অনেক শান্ত হইয়াছিল, তথাপি গঙ্গা ও যমুনার তীরস্থ এবং বঙ্ক ও মেওয়াত পর্ব্বতের রাজারা পর্ব্বতবাসী দস্যুগণের দৌরাত্ম্যে অত্রগামী হইয়াছিলেন। বলীন ঐ দস্যুগণকে দমন করিয়া ঐ পর্ব্বতে সৈন্য স্থাপন ও অন্য প্রকার শাসন দ্বারা ঐ উপদ্রব শান্তি করিয়াছিলেন, ইহার জন্য মেওয়াতে অন্যূন লক্ষ মনুষ্যের প্রাণ দণ্ড করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি ঐ পর্ব্বতের অনেক জঙ্গল কাটাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে

তদবধি ঐ পর্ব্বত দস্যুর বাসস্থান না হইয়া কৃষিগণের উপজীবিকার পথ হইয়াছিল।

৬৭৪ অব্দে তোগ্রল নামে বঙ্গদেশীয় সুবাদার জাজ নগর জয় করিয়া দিল্লীশ্বরকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রদান করেন নাই, এবং আপনি রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্বীন তাঁহার দণ্ড হেতু সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে দমন করিতে পারিল না; বাল্বীন তাহাতে সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিয়া আর এক জন সেনাধ্যক্ষ প্রেরণ করিলেন; এই সেনাপতিও বশ করিতে পারিলেন না, তাহাতে তিনি স্বয়ং সসৈন্যে বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তোগ্রল তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া সসৈন্যে অরণ্যে পলায়ন করিলেন। বাল্বীনের এক জন সেনানী তাহার সন্ধান পাইয়া চল্লিশ জন মনুষ্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তোগ্রল এই সেনাপতি ও তাঁহার চল্লিশ জন সঙ্গীকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু পশ্চাতে রাজসেনা আসিতেছে এই ভয়ে তাহা না করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন, তাহাতে নদী পার হইবার সময় ঐ সেনাপতি তাঁহাকে বধ করিলেন। তোগ্রলের মৃত্যুর পর বাল্বীন বঙ্গদেশে অনেক অত্যাচার করিলেন, পরে আপনার দ্বিতীয় পুত্র কেরাকে তথাকার অধিপতি করিয়া দিল্লী

প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে আসিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহদের মৃত্যু হইল। ঐ রাজপুত্র পঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন। পিতা বঙ্গদেশের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পরে পারস দেশের রাজা আরগান খাঁ অনেক মোগল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তিনি তথায় যাইয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। তৎপরে বিখ্যাত তিমুর খাঁ ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু যখন তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন তখন তিমুর খাঁয়ের কতকগুলা সেনা তাঁহাকে বিনাশ করিল। মহাকবি আমির খশরু ঐ সঙ্গে রণবন্দী হন।

সাহদ অতি সৎ ও উপযুক্ত ছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যুতে অপর সাধারণ সকলে শোকাকুলিত হইল। বালীন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং পুত্র-শোকে ভগ্নোদ্যম হইয়া, কেরাকে রাজ্য অর্পণ করিবার মানসে বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন করাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল না, তাহাতে কেরা পিতার অনুমতি না লইয়া বঙ্গদেশে পুনর্গমন করিলেন।

বালীন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র কৈখসরুকে রাজ্য প্রদানের অভিলাষ করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে আপ্তবিচ্ছেদে রাজ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে তিনি কৈখসরুকে পঞ্জাবের সুবাদারী দিয়া, কেরার পুত্র কৈকোবাদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। কেরা বঙ্গদেশের সুবাদার রহিলেন। বালীন ২০ বৎসর রাজ্য করিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে, ৬৮৫ অব্দে, পরলোক গমন করিলেন।

খৃ ১২৮৬
হং ৬৮৫

কৈকোবাদ।

কৈকোবাদ যখন সিংহাসন আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তিনি রাজা হইয়া বয়সের ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইলেন, এবং নিজাম নামে তাঁহার এক জন বয়স্য সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে লাগিল। এবং ভবিষ্যতে রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় প্রথমতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা কৈখসরুকে নষ্ট করাইল, পরে আর ২ যে সকল মন্ত্রী রাজার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত ও হত করিল। নিজামের ভার্য্যাও অন্তঃপুরে থাকিয়া অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইল। ইহাতে কোন লোক তাঁহার নিকটে যাইতে বা কোন কথা বলিতে পারিত না,

সুতরাং নিজামের যাহা মনে হইত তাহাই করিত, এবং তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোক অস্থির হইয়া উঠিল।

কেরা নিজামের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া পুত্রকে বারম্বার পত্র লিখিলেন তাহার পরামর্শ না শুনেন, কিন্তু কৈকোবাদ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। অনন্তর কেরা পুত্রকে উপদেশ দানার্থ আপনি দিল্লী নগর যাত্রা করিলেন। নিজাম তাহার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া রাজাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিল। কৈকোবাদ সেই কথায় চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইলেন। কেরা পুত্রের এই ভাব দর্শন করিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন, যুদ্ধ করিতে হয় পরে করিও, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে প্রথমতঃ একবার সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করি। কৈকোবাদ পিতার এই পত্র পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমন্ত্রীর পরামর্শ এই স্থির হইল যে তিনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, কেরা সামান্য মনুষ্যের ন্যায় সেলাম করিতে২ তাঁহার সম্মুখে আসিবেন।

কেরা কি করেন, ভুমিষ্ঠ হইয়া পুত্রকে তিনবার সেলাম করিলেন, এবং পুত্রের অপুত্রবৎ কার্য্যে দুঃখ

বোধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ পিতার ক্রন্দন দর্শনে সিংহাসনে থাকিতে, না পারিয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিতে গেলেন। কেরা তাহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া ভুজদ্বয়ে তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন। তখন উভয়ের নেত্রবারি বর্ষণ হইতে লাগিল। সভাসদ্গণ তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর কৈকোবাদ পিতাকে সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া তাঁহার উচিত সম্মান করিলেন। কেরা তাহার পর নির্জ্জনে অনেক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কুরীতি দূর জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিলেন। কৈকোবাদ অঙ্গীকার করিলেন আর কুকর্ম্মে রত হইবেন না, এবং নিজামের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। তদনন্তর পিতা বঙ্গদেশে, এবং পুত্র দিল্লী নগরে গমন করিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাগমনের পর কৈকোবাদ কিছুকাল সুনিয়মে চলিলেন। তাহাতে এমন বোধ হইল তিনি নিজামের শঠতাচক্রে আর পাদক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ঐ শঠশিরোমণি তাঁহাকে অতি সুন্দরী ২ কামিনী আনিয়া দিল, তাহাতে তিনি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইলেন। এই সকল কুক্রিয়াতে তাঁহার শরীর একেবারে

জীর্ণ হইয়া পক্ষাঘাত রোগ জন্মিল। তখন মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ চেতনা পাইয়া সকল অমঙ্গলের মূল নিজামকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা বিনাশ করাইলেন। কিন্তু এক শত্রুর নিপাত হইয়া অনেক শত্রুর উৎপত্তি হইল। তাহার কারণ, প্রধান পক্ষীয় লোকেরা রাজ্যাভিলাষী হইলেন, ইহার মধ্যে খিলিজী জাতীয় প্রধানেরা অতি প্রবল ছিলেন। তাঁহারা কৈকোবাদকে হত্যা করিয়া জলালউদ্দীন খিলিজীকে সিংহাসন দিলেন। তদবধি খিলিজীরা রাজ্যাধিপতি হইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

খিলিজী রাজাদিগের রাজ্যশাসন।

জলালউদ্দীন।

খৃঃ ১২৮৮
বঃ ৪৩৯০

হিজরী ৬৮৭ অব্দে যখন জলাল-উদ্দীন রাজাসন গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। তিনি বালীনের অত্যন্ত অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তিনি প্রথমতঃ রাজবাটীতে অশ্বারোহণ না করিয়া পদব্রজে যাইতেন, এবং সিংহাসনে উপবেশন না করিয়া পূর্ব্বাসনে বসিতেন। কিন্তু রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি কৈকোবাদের শিশু সন্তানকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, তৎপরে রাজপদে দৃঢ়ীভূত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। এই কর্ম্মে যে অপবাদ হইয়া থাকুক, তাহার পর তাঁহার চরিত্রের আর কোন দোষ দর্শন হয় নাই। বরং তিনি অত্যন্ত দয়া-পরবশ হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

তাহার প্রমাণ, বালীনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লী লইবার বাসনায় রণসজ্জা করিয়া আসিলে, তাঁহার

দ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে রণবন্দী করিয়া আনিলেন। জলালউদ্দীন তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাহাদের প্রধানকে মুলতানের সুবাদারী দিলেন। তৎপরে তাঁহার স্বদেশীয় কতকগুলা লোক তাঁহাকেই বিনাশ করিয়া রাজ্য লইবার মন্ত্রণা করিল, তাহা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। এই সকল কর্ম্ম অতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু দুষ্টদমন যে রাজধর্ম্ম তাহা হইল না। সুতরাং সুবাদার বা তহশীলদার যিনি যেখানে ছিলেন সেইখানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। করদ রাজগণ রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন, এবং দস্যুবৃত্তি এত বৃদ্ধি হইল যে তাহাতে দূর পথে গমনাগমন একেবারে রহিত হইল।

এই প্রকার অনেক অত্যাচার হইতে লাগিল। বিশেষতঃ মালব রাজ্যে মহা রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এই বিদ্রোহ দমনার্থ জলালউদ্দীন স্বয়ং সসৈন্যে দুইবার যাত্রা করিলেন। কিন্তু রক্তস্রাবের নিতান্ত অনিচ্ছা ও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কয়েকটা প্রধান দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে ঐ বিদ্রোহ একেবারে নিবারণ হইল না। কিয়ৎকাল পরে মোগলদল আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিল। তখন

তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে পরাজয় করণানন্তর ৩০০০ মোগলকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া দিল্লীনগরে আনিলেন। এই মোগলেরা তদবধি দিল্লীতে বাস করিতে লাগিল।

পর বৎসর মালবে পুনর্ব্বার রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। তাহাতে জলালউদ্দীন পুনর্ব্বার স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহা সম্যক্রূপে নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরে, আলাউদ্দীন নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত কেরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি পিতৃব্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বুন্দেলখণ্ড ও মালবের পূর্ব্ব অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিয়া কয়েকটা দুর্গ জয় করিলেন। জলালউদ্দীন এই সম্বাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যা রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

আলাউদ্দীন অযোধ্যা রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ রাজ্য জয় করণাভিলাষে কেবল ৮০০০ মনোনীত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বরার পর্য্যন্ত অবাধায় গমন করিলেন। তথা হইতে ইলিচ পুরে যাইয়া এই কথা প্রকাশ করিলেন যে, কোন বিষয়ে পিতৃব্যের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুরাজাদিগের কর্ম্ম করিবার বাসনায় তদ্দেশে আসিয়াছেন। এই কথায় তত্রস্থ রাজারা এক প্রকার

নিঃশঙ্ক হইলেন। কেহ সংগ্রাম সজ্জা করিলেন না। তাহাতে তিনি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া একবারে মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগিরিতে উপনীত হইলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেবের এমন আয়োজন ছিল না যে উঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, সুতরাং সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া তিনি নিকটস্থ এক পর্ব্বতীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন।

আলাউদ্দীন তাবৎ নগর লুণ্ঠন করিলেন, এবং যাবতীয় ধনী ও মহাজন লোক দিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। তদনন্তর রাজা রামদেব যে দুর্গে পলায়ন করিয়াছিলেন তথায় যাইয়া উঁহাকে বেষ্টন করিলেন, আর ভয় প্রদর্শনার্থে ইহাও প্রকাশ করিলেন, উঁহার সঙ্গে যে সেনা আসিয়া ছিল তাহারা অগ্রগামী রক্ষক সেনা, উঁহাদিগের পশ্চাৎ অসঙ্খ্য রাজসৈন্য আসিতেছে। শান্তস্বভাব মহারাষ্ট্রাধিপতি এই কথায় ভয় পাইয়া উঁহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃকল্প জানিলেন এবং সন্ধির উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে উঁহার পুত্র অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই যুদ্ধে তিনি অনায়াসে জয়ী হইতে পারিতেন, কিন্তু আলাউদ্দীন কতকগুলা সৈন্য পশ্চাৎ রাখিয়া গিয়া-

ছিলেন তাঁহারা হঠাৎ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদিগকে রাজসৈন্য জ্ঞান করিয়া হিন্দু সেনাগণ পলায়ন করিল, সুতরাং তিনি জয়ী হইতে পারিলেন না। তথাপি অন্য সেনার আশ্বাসে রাজা হঠাৎ সন্ধি না করিয়া দুর্গমধ্যে থাকিলেন, মনে করিলেন অন্য সৈন্য আনিলে তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু এক অভাবনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন সৈন্যদিগের আহারার্থ ময়দা জ্ঞান করিয়া যে সকল বস্তা আনা হইয়াছিল তাহা ময়দার বস্তা নহে, সমুদয় লবণে পূর্ণ, অতএব শত্রুজালে বেষ্টিত আহারীয় দ্রব্য আনিবার পথ রুদ্ধ, আহারাভাবে সৈন্যগণ কি প্রকারে দুর্গে প্রাণ ধারণ করে, ইহা বিবেচনা করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আলাউদ্দীনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইল, তিনি যত অর্থ চাহিলেন তাহাই দিতে হইল, তা ভিন্ন ইলিচপুর ও তদধীন সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইল। এই প্রকারে আলাউদ্দীন বুদ্ধিকৌশলে মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিলেন, এবং অসংখ্য অর্থ ও হয় হস্তী লইয়া খন্দেস দিয়া মালবে প্রত্যাগমন করিলেন।

মুসলমানের রাজ্যারম্ভ হইতে অবধি, মহারাষ্ট্র দেশ তিন শত বৎসর স্বাধীন ছিল, এবং হিন্দুস্থান হইতে ইহার পথ কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া

ছিল, তাহাতে আলাউদ্দীন শুদ্ধ ৮০০০ সেনা লইয়া ঐ রাজ্য জয় করিলেন, ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে, ইহাতে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু যি পিতৃব্যকে যেপ্রকারে হত্যা করেন তাহাতে তাঁহার নামে কলঙ্কপাত হইয়াছে।

এ হত্যার বিবরণ এই—তিনি পিতৃব্যের বিনানুমতিতে মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে, কি জানি তিনি রুষ্ট হইয়া থাকিবেন, এই ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া একেবারে আপন রাজ্যে গমন করেন। জলালুদ্দীন আলাউদ্দীনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; এবং অনেক দিবসাবধি তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ছিলেন। অতএব যখন শুনিলেন আলাউদ্দীন মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সে দুর্ভাবনা দূর হইয়া মনের মধ্যে আহ্লাদ জন্মিল। ঐ আমোদে তিনি তাঁহার সহিত সে রাজ্যে সাক্ষাৎ করিতে আপনি গমন করিলেন।

আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে দেখিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। জলালুদ্দীন তাঁহার বদন চুম্বন পূর্ব্বক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন আমি তোমাকে বাল্য কালাবধি লালন পালন করিয়াছি, এবং পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করিয়া থাকি, ইহাতেও তুমি আমাকে অবিশ্বাস

কর, ইহার কারণ কি, এ কর্ম্ম তোমার উচিত নহে। তিনি এই প্রকার খেদ-বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে আলাউদ্দীনের সঙ্কেত-ক্রমে তাঁহার শিক্ষিত কয়েক জন লোক আসিয়া একেবারে তাঁহাকে দুই খণ্ড করিল।

হিং ৬৯৫ } তৎপরে তাঁহার ছিন্ন মস্তক একটা
খৃ ১২৯৬ } বর্ষার অগ্রে বিদ্ধি। সৈন্যমণ্ডলী
কং ৪৩৯৮ }

মধ্যে ও ভাবনগরে প্রদর্শিত করিল। জলালুদ্দীন সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকিবে।

জলালুদ্দীনের রাজত্ব কালে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এই—সিদ্ধিমোলা নামে পারস দেশীয় এক উদাসীন অনেক দেশ ভ্রমণ করণানন্তর দিল্লী নগরে আসিয়া এক বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন, অতিথিশালাতে অনেক লোক প্রতিপালন হইতে লাগিল। সিদ্ধিমোলা স্বয়ং তণ্ডুল ভোজন করিতেন, এবং ভার্য্যা বা ভৃত্য কিছুই রাখিতেন না, অথচ বড়২ লোকদিগকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি উৎকৃষ্ট রূপে ভোজনাদি করাইতেন, এবং সম্ভ্রান্ত মনুষ্যেরা বিপদে পড়িলে তাঁহাদিগকে এককালে দুই তিন সহস্র মুদ্রা দান করিতেন। এই প্রকার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া প্রথমতঃ সকলের অনুভব হইল তিনি কোন স্পর্শপ্রস্তর

পাইয়া থাকিবেন। পরে জনরব হইল তিনি রাজ্যা-কাঙ্ক্ষাতে এই সকল করিতেছেন। জলালউদ্দীন এই কথায় ভীত হইয়া তাঁহাকে বিচার জন্য আনয়ন করাইলেন, কিন্তু তাঁহার অসদভিপ্রায় কিছুই প্রমাণ হইল না, তাহাতে কেহ২ কেহ বলিলেন তিনি অগ্নিকুণ্ড প্রবেশ করিয়া আপনার দোষ পরিহার করিবেন। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ অতএব তাহা না করিয়া রাজা তাঁহার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যায় তখন রাজার উপদেশমতেই হউক বা আপন ইচ্ছাতেই হউক কয়েক জন উদাসীন তাঁহাকে রাজসমক্ষে সংহার করিল। জলালউদ্দীন শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। যাহাহউক তৎকালে একটা ঘূর্ণীয় বায়ু উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলের মহা শঙ্কা হইল কোন দৈব বিপাক হইবে। কিছুদিন পরে রাজার এক পুত্র পরলোক গমন করিলেন, এবং ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইল, তৎপরে জলালউদ্দীন অসৎ ভক্ত হইলেন। ইহাতে সাধারণে সকলের এমত প্রতীয়মান হইয়াছিল, সিদ্ধিমোলার মৃত্যুতে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

আলাউদ্দীন।

হিং ৬৯৫ }
খৃ ১২৯৫ }
কং ৪৩৯৮ }

দিল্লীনগরে জলালউদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হইলে, রাজরাণী আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীন অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাতে রাণী সে আশায় বঞ্চিত হইয়া, ঐ পুত্রকে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ মুলতানাধিপতির নিকটে পলায়ন করিলেন। আলাউদ্দীন উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিলেন, এবং রাণীকে চিরবন্দিনী করিয়া রাখিলেন।

এই প্রকার দুষ্ক্রিয়া দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আলাউদ্দীন প্রজাগণকে আপনার বশীভূত করিবার জন্য দান বিতরণ ও অনেকানেক লোককে উচ্চ২ কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার সর্ব্বগ্রাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রযুক্ত তিনি কাহারও প্রিয় হইতে পারিলেন না। বিদ্রোহ ও রাজ্য লইবার কুমন্ত্রণা সর্ব্বদা হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি সতত অস্থির থাকিলেন।

আলাউদ্দীনের প্রথম যুদ্ধ গুজরাটের রাজার সহিত হয়। সাহেবউদ্দীন মহম্মদ এই দেশ জয় করিয়া যে সৈন্য তথায় রাখিয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে গুজরাটাধিপতি দিল্লীশ্বরের

প্রভুত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক কর দান রহিত করেন। আলাউদ্দীন ঐ দেশ পুনর্জ্জয় করণার্থ স্বীয় ভ্রাতা আলেফ খাঁ ও তন্মন্ত্রী নজরত্ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। ইহাঁরা তথায় যাইয়া অচিরাৎ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। গুজরাটাধিপতি পরাজিত হইয়া ধনের মধ্যে একটী বালিকা কন্যা লইয়া বনের মধ্যে দিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যে পলায়ন করিলেন। তাঁহার আর আর ঐশ্বর্য্য ও পরিবার সকল পড়িয়া রহিল। মুসলমান সেনারা তাহা সমুদয় লুঠ করিল এবং রাজান্তঃপুর বাসিনী অনেক কামিনীকে বন্দিনী করিয়া দিল্লীতে আনিল। এই সকল রমণীর মধ্যে কমলা নাম্নী রাজার এক ভার্য্যা ছিলেন। কথিত আছে তত্তুল্য সুন্দরী নারী তৎকালে ভারতবর্ষে আর ছিল না। দিল্লীশ্বর কমলাকে পাইয়া অচলা ভক্তি পূর্ব্বক আপনার রাজরাণী করিলেন.

এই যুদ্ধে সৈন্যগণ অনেক অর্থ লুঠ করিয়াছিল, বিচারতঃ তাহারাই তাহার অধিকারী। কিন্তু সেনাপতিগণ তাহা রাজধন বলিয়া অধিকার করিতে চাহিল সেনাগণ তাহাতে আপত্তি করিল, সুতরাং একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তাহাতে মন্ত্রীর ভ্রাতা এবং রাজার এক ভ্রাতুষ্পুত্র হত হইলেন। রাজা তাহা শুনিয়া সকল সৈন্যকে খড়্গসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে অনেক সেনা খড়্গমুখে প্রদত্ত হইল। কতক

গুলিন সেনা পলায়ন করিল। আলাউদ্দীন তাহা-দিগকে ধরিতে না পারিয়া তাহাদের পুত্র পরিজন সকলকে গোমেষের ন্যায় বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ইহার পর মোগল সেনাগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই মোগলেরা কেবল লুঠের বাসনাতে আসিত, কিন্তু এবারে তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিবার প্রতিজ্ঞায় দিল্লীমুখে অগ্নিমুখীর ন্যায় আসিতে লাগিল। আলাউদ্দীন তাহাদের গমন প্রতিরোধ জন্য অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বাত্যাতে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া যায়, রাজপ্রেরিত সেনাগণ তাহাদি-গকে দেখিয়া সেই প্রকার পলাইয়া আসিল। অধিকন্তু মোগলদিগের ভয়ে নিকটস্থ প্রদেশের-যাবতীয় প্রজা গৃহ দ্বার ও নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীনগরে আসিতে লাগিল। এই সকল লোকের আগমনে দিল্লীনগর এমত জনাকীর্ণ হইল, যে, পথ ঘাটে লোকের চলাচল একেবারে বন্ধ হইল, দ্রব্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য হইল, এবং অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ হইল।

আলাউদ্দীন স্থির করিয়া ছিলেন মোগলেরা আক্র-মণ করিলে আপনাকে রক্ষা করিবেন মাত্র, নগর হইতে যাইয়া তাহাদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু যখন নগরে লোক পরিপূর্ণ এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, তখন অনন্যগতি হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর

হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প জানিলেন। অতএব রাজ্যের সৈন্য একত্র করিয়া মহা সমারোহে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে এত সেনা চলিল যে তত্তুল্য সৈন্য ইহার পূর্ব্বে দিল্লী হইতে কখন বাহির হয় নাই। এই সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীন মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কয়েকটা মহা যুদ্ধ হইল। শেষ যুদ্ধে জাফর খাঁ নামে তাঁহার এক জন বিখ্যাত সেনাপতি অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সংগ্রাম কৌশলে মোগল দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। কিন্তু যখন তিনি পলায়িত সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, আলাউদ্দীন বা তাঁহার ভ্রাতা কেহই তাঁহার সহায়তা করিতে গেলেন না, সেনাপতি একাকী পড়িয়া যুদ্ধে হত হইলেন। জাফর খাঁ অতি বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি জীবিতমান থাকিলে পাছে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা করেন আলাউদ্দীন মনে২ সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিতেন এই জন্য তাহার সহায়তা করেন নাই।

মোগল সেনার গ্রাস হইতে রাজ্য উদ্ধার হইলে পর, আলাউদ্দীন রিন্তাম্বর অধিকারার্থ মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী প্রথমতঃ ঝায়ন জয় করিয়া রিন্তাম্বর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তাহাতেই হত হইলেন। এই বিভ্রাটি জন্য রাজভ্রাতা অন্য সেনার অপেক্ষায় আক্রমণে ক্ষান্ত হইয়া ঝায়নে ফিরিয়া আসিলেন। আলাউদ্দীন তাহার সহায়তার

জন্য স্বয়ং সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় তিনি যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন তাহাতে তাঁহার পুনর্জন্ম বলিতে হইবে। তদ্বিবরণ এই—তিনি যে প্রকারে পিতৃব্যকে সংহার করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সলিমান নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে সেই প্রকার সংহার করিয়া রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এক দিবস আলাউদ্দীন সৈন্যশিবিরের কিয়দ্দূরে মৃগয়ার্থ গমন করিলে, তিনি মুসলমানমতাবলম্বী কতক গুলিন মোগল অশ্বারোহী ধনুর্দ্ধর সমভিব্যাহারে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই জানিতেন না। তাঁহার সমভিব্যাহারি লোকেরা বন্য পশুর অন্বেষণে গমন করিলে তিনি একাকী অশ্বারোহণে থাকিলেন। ঐ সময়ে সলিমানের সঙ্গী মোগলেরা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি এমন তীর ক্ষেপ করিল যে তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া একেবারে অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইলেন। সলিমান তাঁহার মৃত্যু অবধারিত করিয়া অবিলম্বে সৈন্য শিবিরে উপনীত হইলেন এবং পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনি রাজা হইলেন।

আলাউদ্দীন কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার ক্ষত স্থান বন্ধন

করিয়া দিল। তখন তিনি নিঃসহায়, সকলই বিপক্ষের পক্ষ, ইহা বিবেচনা করিয়া মনে করিলেন সম্প্রতি জয়নে ভ্রাতার সন্নিধানে গমন করি, তাহার পরে যাহা হয় করিব। তাঁহার এক জন সঙ্গী কহিল একর্ম্ম ভাল নহে, রাজ্য একবার হস্তান্তরিত হইলে তাহা পুনর্ব্বার পাওয়া দুষ্কর হইবে, তুমি অবিলম্বে শিবিরে উপস্থিত হও। আলাউদ্দীন এই পরামর্শ শুনিয়া, সঙ্গিগণ প্রত্যাগত হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ছাউনীর সম্মুখবর্ত্তী এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকের উপর শ্বেত চক্র ধারণ করাইলেন। তাহা দেখিয়া যাবতীয় সৈন্য তাঁহার নিকটে আসিল। তাহাতে সলিমান আপন কল্পনা ব্যর্থ বুঝিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু রাজসেনারা তাঁহার পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। এবং তাঁহার সঙ্গী সকলের প্রাণ দণ্ড হইল।

এই ব্যাপারের পর আলাউদ্দীন ভ্রাতার সহযোগী হইয়া রিন্তাম্বর আক্রমণ করিলেন। যদিও তাহাতে হঠাৎ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু পরে ঐ দেশ জয় করিয়া তদ্দেশীয় রাজা ও তাবৎ সেনাকে খড়্গসাৎ করিলেন।

তদনন্তর তাঁহার আর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বদাউন রাজ্যে রাজপ্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ঐ বিদ্রোহ নিবারণ জন্য তিনি স্বয়ং গমন

না করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা বিদ্রোহ দমন করিয়া তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্ধদশায় আনয়ন করিল। তিনি তাহাদের চক্ষুঃ উৎপাটন পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিলেন।

আলাউদ্দীনের এই প্রকার অতি কঠিন শাসন ছিল, কিন্তু তাহাতেও রাজবিদ্রোহ একবারে নিবারণ হয় নাই। দিল্লীনগরে এক মহা বিদ্রোহ হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এই—কোন সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের হাজিমৌলা নামে এক ক্রীতদাস ছিল। ঐ দাস দিল্লীনগরের শান্তিরক্ষকের সঙ্গে কোন বিষয়ে বিবাদসূত্রে ক্রুদ্ধ ও হতজ্ঞান রহিত হইয়া মনুষ্য একত্র করিয়া শান্তিরক্ষকের শিরশ্ছেদন করিল। তাহার পরে ঐ সকল লোক সশস্ত্রবাহুল্যে উন্মত্তভাবে যাবতীয় কারাগারস্থ লোকদিগকে মুক্ত করিয়া, রাজ-ভাণ্ডার ও আর আর অনেক স্থান লুণ্ঠন করিল। পরে রাজপরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইল। সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল, আর সকল লোকেরা রাজ্যের প্রধান হইল। তাহাদিগকে দমন করিবার কোন উপায় রহিল না। পরে এক রাজ-কর্ম্মকারক কোন কৌশলে নগরে কতকগুলিন সৈন্য আনয়ন করিয়া হাজি মৌলাকে বধ করিলেন। তাহাতে তাহার সঙ্গীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, যিনি রাজা হইয়াছিলেন তিনিও

খড়্গসাৎ হইলেন। এবং দোষী নির্দ্দোষী অনেক মহাপ্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইল। আলাউদ্দীনের আদেশে, হাজিমৌলা যাহার গৃহে কর্ম্ম করিত তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে, বিনা অপরাধে, খড়্গমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

১৩০৫ অব্দে, আলাউদ্দীন মিবার পর্ব্বতে চিতুর নামে রাজপুতদিগের বিখ্যাত দুর্গ জয় করিয়া, তদ্দেশীয় রাজাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করেন। এই যুদ্ধ-ঘটিত এক রহস্যের কথা আছে তাহাও এখানে লেখ যাইতেছে। চিতুর রাজার এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। আলাউদ্দীন তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে ঐ রাজাকে বলিলেন যদি আমাকে তোমার কন্যা দান কর তবে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দি। রাজা কি করেন কন্যাদানে সম্মত হইলেন। তাহাতে দিল্লীশ্বর তদ্দুহিতাকে আনয়ন জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কন্যা অতি বিচক্ষণা ছিলেন, তিনি দিল্লীতে যাইবেন ইহা জানাইয়া কতকগুলা শিবিকা প্রস্তুত করাইলেন। একখানা শিবিকা তাঁহার জন্য উত্তমরূপ সুসজ্জীভূত হইল, আর সকল শিবিকা পরিচারিণীগণের জন্য প্রস্তুত হইল। প্রচার হইল তিনি পরিচারিণীগণ সমভিব্যাহারে দিল্লীতে যাইতেছেন। বস্তুতঃ আপনি না যাইয়া অন্যান্য কতকগুলিন অস্ত্রধারী

পুরুষ পাঠাইলেন। সেই সকল অস্ত্রধারী পুরুষ দিল্লী-
নগরে উপনীত হইয়া সম্রাটের নিকট সংবাদ করিল
রাজকন্যা আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে একবার
পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করেন। আলা-
উদ্দীন তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন শিবিকা সকল কারা-
গারে লইয়া যায়। শিবিকা সকল কারাগারে নীত
হইলে অস্ত্রধারী মনুষ্যেরা বাহির হইয়া প্রথমতঃ
প্রহরীগণকে সংহার করিল। তৎপরে তাহারা চিতুরা-
ধিপতিকে লইয়া দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণে পলায়ন
করিল। কেহ বলে চিতুরের রাণার পরামর্শানুসারেই
এই কাণ্ড হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি মুক্ত হইয়া
আলাউদ্দীনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি-
লেন। তাহাতে আলাউদ্দীন ভয় পাইয়া তাঁহার এক
ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঐ রাজ্য অর্পণ করেন।

ঐ সময়ে মোগলেরা পুনর্ব্বার দিল্লী আক্রমণ করিল।
তাহার পর আরও দুই তিন বার তথায় আসিয়া-
ছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই, বরঞ্চ অনেক
মোগল রণবন্দী হইয়াছিল। তাহারা দিল্লীতে আনীত
হইলে তাহাদের প্রধানেরা হস্তি-চরণে মর্দ্দিত এবং
আর২ সকল খড়্গমুখে অর্পিত হইল। শত্রুরা রণ-
বন্দী হইলে তৎকালে এই প্রকার দণ্ড হইত।

যখন আলাউদ্দীন চিতুরের যুদ্ধে গমন করেন,

তখন অরঙ্গল নামে গোদাবরীতীরস্থ তৈলঙ্গ রাজ্যের রাজধানী আক্রমণ জন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। মলক্ কাফর নামে এক নপুংসক ঐ যুদ্ধের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে এক গুজরাটী মহাজনের ক্রীত দাস ছিলেন, পরে রাজানুগ্রহে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। মলক্ কাফর মহারাষ্ট্র রাজ্যে উপনীত হইয়া ঐ দেশ লুণ্ঠন এবং ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। এবং রাজা রামদেবকে এমত ব্যতিব্যস্ত করিলেন যে তিনি তাঁহার সঙ্গে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় উপস্থিত হইলে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক দেশে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। সে পর্য্যন্ত তিনি মুসলমান রাজাদিগের সঙ্গে আর যুদ্ধাদি করেন নাই।

এই সময়ে আর এক ঘটনা হইয়াছিল তাহাও লেখা কর্ত্তব্য। আলাউদ্দীন যখন মহারাষ্ট্র দেশ পুনর্জ্জয় করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন কমলা দেবী অনুরোধ করিলেন, দেবলদেবী নামে তাঁহার যে কন্যা তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর নিকটে আছে, তাহাকে আনয়ন করিতে হইবে। দিল্লীশ্বর ঐ অনুরোধে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আলেফ খাঁকে পত্র লিখিলেন, যে প্রকারে হউক ঐ কন্যাকে দিল্লীনগরে লইয়া আসিবে। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে গুজরাটাধিপতি কন্যাকে লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে

পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেফ খাঁ রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেব আপন পুত্রের সহিত এই কন্যার বিবাহ জন্য ঐ চিতুরাধিপতিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রক্তপুত্রবংশীয়েরা মহারাষ্ট্রদিগের সহিত কুটুম্বিতা করিতেন না, তাহাতে অপমান বোধ হইত, এজন্য তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু যখন মুসলমান রাজা তাঁহার কন্যাকাঙ্ক্ষী হইলেন, তখন মহারাষ্ট্র-রাজপুত্রকে কন্যা দেওয়া শ্লাঘা জ্ঞান করিয়া, তাহাকে দেবগিরিতে প্রেরণ করিলেন। আলেফ খাঁ তাহা জানিতে পারি-লেন না, কন্যা রাজার নিকটে আছে এই বিবেচনা করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিবার মানসে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যুদ্ধেও জয়ী হইলেন, কিন্তু পরে দেখি-লেন, যে দেবল দেবীর জন্য যুদ্ধ, তিনি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল; কেননা আলাউদ্দীন কন্যা আনিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে আনিতে না পারিলে মস্তক ছেদন হইবে। এই ভয়ে তিনি অবিলম্বে দেবগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া রাজকন্যা বা তাহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না, ইহাতে আরও বিপদগ্রস্ত হইলেন।

অনন্তর তাহার কতকগুলা সেনা ইলোরার গুহা দর্শন করিতে গিয়াছিল। গুজরাটাধিপতি যে সকল সৈন্য সমভিব্যাহারে কন্যাকে দেবগিরিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, দৈবযোগে তৎকালে তাহারাও গুহা দর্শন করিতেছিল। কথায় কথায় তাহাদিগের সহিত মুসলমান সেনাদিগের বিবাদ ঘটিল। তাহাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া হিন্দুসেনারা পরাভূত হইল। রাজকন্যা ঐ সৈন্যদিগের মধ্যে ছিলেন, মুসলমান সেনারা তাহা জানিত না। কিন্তু রাজকন্যার অশ্ব শরক্ষতে আহত হইলে যখন মুসলমানেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত, তখন তাঁহার পরিচারিণীগণ তাহাদিগকে সাবধান করিয়া কহিল সাবধান ইহার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিও না ইনি রাজকন্যা। এই কথা শুনিয়া মুসলমানসেনাগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে আলেফ খাঁর নিকটে লইয়া গেল। আলেফ খাঁ রাজকন্যা পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন, এবং স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া দিল্লী নগরে গমন করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন, এবং রাজপুত্র খজর খাঁ তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

এই ঘটনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে তৎকালে মুসলমানেরা হিন্দুস্ত্রী বিবাহ করিতেন। এবং যুদ্ধ সময়ে

মুসলমানেরা যে সকল হিন্দুনারী রণবন্দী করিয়া লইয়া যাইতেন তাহাদের সঙ্গেও আহার ব্যবহার করিতেন। এতদ্দেশে যে সকল মুসলমান একণে দেখাযায় ইহারা ঐ সকল হিন্দুনারীদিগের গর্ব্ভজাত।

আরো দৃষ্ট হইতেছে ইলোরার গুহা সকল আলা-উদ্দীনের রাজত্বকালে প্রথম প্রকাশ হয়। এই সকল গুহা নরকীর্ত্তির মধ্যে অতি অদ্ভুত। মনুষ্যের দ্বারা যে সকল বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, মিশর দেশের প্রস্তর-ময় গোরস্থান সকল তন্মধ্যে অতি প্রশংসনীয় ও আশ্চর্য্য, কিন্তু ইলোরার গুহা তাহা অপেক্ষাও অদ্ভুত। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৮৯ পৃষ্ঠাতে তদ্বিবরণ লেখা গিয়াছে।

যখন কাফর খাঁ মহারাষ্ট্র দেশের যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং মেওয়ার পর্ব্বতে ঝালর ও মেওয়ানা নামক দুই স্থান অধিকার করেন। কাফর প্রত্যাগত হইলে আলাউদ্দীন শুনিলেন, টেলঙ্গ জয়ার্থ যে সৈন্য প্রেরিত হইয়া ছিল তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অতএব তিনি কাফরকে সৈন্যা-ধ্যক্ষ করিয়া উড়িষ্যার পথ দিয়া তদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। কাফর কয়েক মাস যুদ্ধ করিয়া অরঙ্গ-লের দুর্গ জয় ও তদ্দেশীয় রাজাকে করদ করিলেন।

কাফর খাঁ পর বৎসর পুনর্ব্বার দক্ষিণ রাজ্যে গমন

করিলেন, এবং গোদাবরী পার হইয়া কর্ণাটের বেলাল বংশীয় রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া, দ্বারসমুদ্র নামে তাঁহার রাজধানী অধিকার করিলেন। তাহার পর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় এক মসজীদ নির্ম্মাণ করেন।

ইহার পূর্ব্বাবধি মোগল জাতীয়েরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছিল। ৭১৭ অব্দে আলাউদ্দীন হঠাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন, তাহাতে তাহারা অন্য উপায় না দেখিয়া আলাউদ্দীনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া অন্যূন ১৫,০০০ সহস্র মোগলকে বিনাশ করিলেন, এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে বিক্রয় করাইলেন।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রাধিপতি রামদেব পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীনকে বার্ষিক কর প্রদান করেন নাই, ইহা ভিন্ন কর্ণাটেও নানাপ্রকার কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে, ৭১২ অব্দে, কাফর পুনর্ব্বার তথায় গমন করিয়া ঐ দুই রাজ্য শাসন, এবং ঐ অঞ্চলে আর যে সকল রাজারা স্বাধীনভাবে ছিলেন তাঁহাদিগকে করপ্রদ করিলেন।

যখন আলাউদ্দীন রাজা হন, তখন তিনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, তাহার পর কিঞ্চিৎ পড়া

অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত দাম্ভিক স্বভাব ছিল তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার কথার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। অতি বিদ্বান্ লোকেরাও তাঁহার ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতেন, কেহ আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আলাউদ্দীন আপনাকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, এবং এই অভিমানে মুসলমানদিগের কোরান ও হিন্দুদিগের বেদ সত্ত্বে এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার বাঞ্ছা হইল। তাঁহার আরও প্রতিজ্ঞা হইল, দিল্লীতে এক জন প্রতিনিধি রাখিয়া তিনি আপনি পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইবেন। এই দুই কল্পনাই অসঙ্গত, কিন্তু কাহার সাধ্য তাঁহাকে সেই কথা বুঝায়। যে ব্যক্তি বুঝাইতে যাইবে তাহার মস্তকচ্ছেদন হইবে। এই ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারে নাই।

অবশেষে আলা অলমলক্ নামে দিল্লী নগরের এক প্রাচীন নগরপাল তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু মুসলমানেরা আপনার বল, তাহারা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। হিন্দুরাও পুরুষপুরুষানুক্রমে আপনাদের ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া আসি-

হেছে, তাহারা প্রাণ দিতেও স্বীকার করিবে তথাপি মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না, অতএব মুসলমান ধর্ম্মে তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রবৃত্তি দিবেন। পৃথিবী জয়ের উপলক্ষে তিনি এই কথা বলিলেন যে ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত সুশাসিত হয় নাই, অনেক দেশ অদ্যাপি অনধিকৃত আছে, ইহা ভিন্ন নিজ দিল্লীতে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ দূর দেশে গমন করিলে যদি অন্য লোকে এই রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই রাজ্য অন্যের হস্তগত হইবার আটক নাই, অথচ মহারাজও যে অন্য রাজ্য পাইবেন তাহাও সন্দেহকল্প। আলা অবনলক এই প্রকার মিষ্ট মিষ্ট করিয়া অনেক কথা বলিলেন। আলাউদ্দীন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তিনি যাহা বলিলেন যথার্থ, অতএব নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ ও পৃথিবী জয়ের মানস একেবারে ত্যাগ করিলেন।

আলাউদ্দীন অনেক দূর দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান রাজা এত দূর দেশ জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকালে সর্ব্বদা বিদ্রোহ কলহ উপস্থিত হইত। মন্ত্রিগণ এই সকল বিদ্রোহের তিন কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রথম কারণ এই—অনেক লোক একত্র হইয়া আহার পান

করা দোষ, কেননা সেই সময়ে সকলে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহাতে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় কারণ—বড় বড় মনুষ্যেরা কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া দল ও বল বৃদ্ধি করে, তাহাতে ক্রমে উচ্চ আশা ও রাজ্যবাসনা হয়। তৃতীয় কারণ—কর সংগ্রহকারী ব্যক্তিরা দূর প্রদেশে থাকিয়া অনেক অর্থ ও ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করে, তাহাতেও তাহাদের আশা বৃদ্ধি করে এবং রাজ্যাধিকার করিবার বাঞ্ছা জন্মে।

এই সকল কথা যথার্থ বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন আজ্ঞা করিলেন তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি মদ্যপান করিতে পারিবে না, এবং মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত আজ্ঞাপত্র ভিন্ন কেহ ভোজ বা মহোৎসব দিতে পারিবে না। মান্য লোকের কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে, তাহারা রাজার নিকট প্রার্থনা করিবে, রাজা অনুমতি দিলে বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না। কৃষী লোকেরা সর্ব্বসাকল্যে এত বিঘা ভূমি আবাদ করিতে পারিবে ও এতগুলা বলদ রাখিতে পারিবে, তাহার অধিক পারিবে না। মহাজনেরা অধিক ঘোড়া বা অন্য পশু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। রাজকর্ম্মকারিগণ ভূরি বেতন ভোগ করিতে পারিবে না। এবং বাণিজ্য ও আর আর কর্ম্মের কর নির্দ্ধারিত, এবং তাহা সংগ্রহের কঠিন নিয়ম করিলেন। ইহা ভিন্ন কাহাকে ধনসঞ্চয়

করিতে দিতেন না। হিন্দু বা মুসলমান যাহাকে সম্পত্তিশালী দেখিতেন তাহার ধন হরণ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। ইহাতে ধনাঢ্য লোক প্রায় রহিল না। যে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতে কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিত।

অধিকন্তু আলাউদ্দীনের রাজ্যকালে সকল দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইল, কেহ কোন দ্রব্যের অধিক মূল্য লইতে পারিত না। এবং সরকার হইতে গোলা প্রস্তুত হইল, তাহাতে মহাজনেরা শস্যাদি আনিয়া রাখিত। দেশের দ্রব্য কেহ স্থানান্তরে পাঠাইতে পারিত না, বরং অন্য স্থানের দ্রব্যাদি আমদানী হয় ইহার জন্য সরকার হইতে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইত। এবং দোকানাদি খুলিবার ও বন্ধ করিবার সময় পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল, তাহার অন্যথা করিলে রাজদণ্ড হইত। এই প্রকার আর আর অনেক নিয়ম হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বহু দিবস থাকে নাই, কতক দিবস চলিয়া ক্রমে রহিত হইল।

আলাউদ্দীন বয়োধিক হইয়া আহার পান ও ইন্দ্রিয়সুখে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইল, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতেন। এই পীড়ার জন্য তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ক্রোধপরায়ণ এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন, কাহা-

কেও বিশ্বাস করিতেন না, কেবল কাফুর তাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল, ঐ ব্যক্তি যাহা বলিত তাহা শুনিতেন, আর আর সকলকে শত্রু জ্ঞান করিতেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ এবং পরশ্রীকাতর, কাহার হিত দেখিতে পারিত না, অতএব উচ্চপদধারী বা উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষী সকলকে ছলে বলে বিনাশ করিল। অবশেষে রাজরাণী ও রাজপুত্রগণের প্রতি রাজার মনোভঙ্গ হয় এজন্য তাহাদের নানা প্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন প্রথমতঃ ঐ সকল কুমন্ত্রণাতে কর্ণপাত করেন নাই, তাহাতে কাফুর তাঁহাকে বলিল যে রাণী ও তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে সংহার করিয়া রাজ্য লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। রাজা ঐ কথায় রাণী ও দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কারারুদ্ধ করাইলেন, এবং অনেক খাঁয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

কাফুর কর্ত্তৃক এবম্বিধ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। রাজনন্ত্রী সকলে বিরক্ত হইলেন, এবং চারি দিক হইতে অসন্তোষ ধ্বনি উঠিল। ঐ সময়ে গুজরাটের বিদ্রোহানল পুনঃপ্রজ্বলিত হইল, চিতোর রাজার পুত্র হমীর সিংহ ঐ রাজ্য পুনর্জ্জয় করিলেন, এবং রাজা রামদেবের জামাতা হরিপাল রাজপ্রভুত্ব অঙ্গীকার করিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্য হইতে মুসলমান সেনাপতিকে দূরীভূত করিলেন। এই সকল কুসংবাদে আলা-

নের মনোযাতনা আরো বৃদ্ধি হইল, তাহাতে তিনি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন কাফর রাজ্য লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিল।

হিং ৭১৭ | খৃ ১৩১৭ | কং ৪৪১৮

মোবারক খিলিজী।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফর তাঁহার এক কৃত্রিম ইচ্ছাপত্র বাহির করিল। তাহাতে এই আদেশ ছিল তাঁহার তৃতীয় পুত্র মোবারক রাজা হইবেন, এবং তাঁহার বয়ঃ প্রাপ্তি না হওন পর্যন্ত কাফর তাঁহার রক্ষক ও কর্ম্মকর্ত্তা থাকিবে। কাফর এই ইচ্ছাপত্রক্রমে রাজারক্ষক হইয়া প্রথমতঃ আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্রের চক্ষুঃ উৎপাটন করাইল, তদনন্তর তাঁহার তৃতীয় পুত্র মোবারককে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু এ কর্ম্ম সাধন জন্য যাহাদিগকে নিযুক্ত করিল তাহারা, কোন কারণবশতঃ তাহা করিল না। অনন্তর রাজসেনাগণ কাফরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং দুই জন সেনাধ্যক্ষ তাহাকে বধ করিয়া মোবারককে রাজসিংহাসন প্রদান করিল।

মোবারক রাজা হইয়া আপন কনিষ্ঠ সহোদরের নেত্রোৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে এক পার্ব্বতীয় দুর্গে রুদ্ধ

করিয়া রাখিলেন। এবং যে দুই রাজসেনাধ্যক্ষের সহকারিতায় তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা-দিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। তৎপরে আপনার ক্রীত দাসগণকে রাজ্যের প্রধান২ কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খসরু খাঁ নামে এক জন হিন্দুকে মন্ত্রিত্ব দিলেন। এই সকল অহিত কর্ম্মের পর তিনি ১৭,০০০ বন্দীকে কারামুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার পিতা যে সকল লোকের মর্য্যাদা হরণ করি-য়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহা ভিন্ন বাণি-জ্যের হানিজনক ও পীড়নকর যে সকল ব্যবস্থা ছিল এবং ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অন্যায় কর নির্দ্ধারিত হইয়া-ছিল তাহা রহিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার যশের প্রতিষ্ঠা হইল। বিদ্রোহ নিবারণেও তাঁহার সুন্দর ক্ষমতা প্রকাশ হইল, কেনন। তিনি গুজরাট রাজ্য শাসন এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্বয়ং যাত্রা করিয়া ঐ দেশ পুনর্জ্জয় করিলেন। মহারাষ্ট্রের রাজা হরিপাল তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাহাকে রণ-বন্দী করিয়া জীবিতাবস্থায় চর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক বিনাশ করিলেন।

কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সুখে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। তিনি অহর্নিশি মদ্যপানে মত্ত থাকিতেন। খসরু খাঁ ইতঃপূর্ব্বে মালাবার জয়ার্থ

প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ দেশ জয় করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলে পর, মোবারক তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন। খসরু খাঁ প্রভুত্ব পাইয়া সজাতীয় হিন্দুসেনা আনিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিলেন, এবং সম্ভ্রান্ত লোক বধ এবং অপর২ লোকের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অনেক মান্য মনুষ্য দেশত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু কাল পরে তিনি প্রভুহত্যা করিয়া আপনি রাজা হইলেন, এবং হিন্দু বন্ধু বান্ধবগণকে উচ্চ পদ প্রদান পূর্ব্বক আপনার দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আলাউদ্দীনের পরিবারস্থ তাবৎ প্রাণীকে সংহার এবং ভুবনমোহিনী দেবলদেবীকে আপন অন্তঃপুরবাসিনী করিলেন।

খসরু খাঁ আর আর যে সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তাহাও এই প্রকার ঘৃণিত, তথাপি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইলেন। এই সকল লোকের সন্তোষার্থ খসরু খাঁ তাহাদিকে উচ্চ উচ্চ কর্ম্ম দিতে লাগিলেন, ইহাতে অনেকেই ভুলিল, কিন্তু পঞ্জাবাধ্যক্ষ গাজী খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন না, তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর গাজী খাঁ দিল্লীতে অমোলাদে উপনীত হইয়া

সকলকে জানাইলেন, যে খসরু খাঁয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে আমার এমন অভিপ্রায় ছিল না যে তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আমি আপনি রাজ্যেশ্বর হইব। খসরু খাঁয়ের অত্যাচারে তাবৎ লোক অস্থির হইয়াছিল, এই জন্য আমি তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বীকে তাঁহার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিলাম। এইক্ষণে রাজবংশীয় যাঁহাকে তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁহাকে সিংহাসন অর্পণ কর। কিন্তু তৎকালে খিলিজী রাজ-পরিবারের কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না, সকলেই হত হইয়াছিলেন। অতএব সকলে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজা করিলেন। গাজী খাঁ, গওয়াসউদ্দীন নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তোগলক গোষ্ঠীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

হিং	৭২১
খৃ	১৩২১
সং	৪৪২৩

গএসাসুদ্দীন তোগলক, বাল্বীন রাজার এক ক্রীত দাসের পুত্র, তাঁহার মাতা হিন্দুকন্যা ছিলেন। তিনি যেমন ভদ্র-ভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কার্য্যও সেই প্রকার ভদ্রতা প্রতিষ্ঠা পাইলেন। তিনি রাজা হইয়া প্রথমতঃ মোগলদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের সদুপায় করিলেন, তাহাতে ঐ সকল অত্যাচার অনেক নিবারণ হইল। অনন্তর, ৭২২ অব্দে, দক্ষিণপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খাঁকে তথায় প্রেরণ করিলেন। জুনা খাঁ অরঙ্গলে যাইয়া দুর্গ বেষ্টন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে হঠাৎ একটা পীড়া উপস্থিত হইল, তাহাতে অনেক সেনা মারা পড়িতে লাগিল। অধিকন্তু তাঁহার কয়েক জন প্রধান সেনাপতি এবং তৎসমভিব্যাহারী সৈন্যগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইহাতে ঐ

স্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি দেবাগিরিতে ফিরিয়া আসিলেন, ঐ সময়ে হিন্দুসেনারা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার সকল সেনা ছিন্ন ভিন্ন এবং সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। তাহাতে তিনি কেবল ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনা কেবল তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, পর বৎসর তিনি অরঙ্গলে পুনর্যাত্রা করিয়া ঐ রাজ্য জয় করিলেন এবং তদ্দেশীয় রাজাকে বন্দীবেশে দিল্লীতে আনিলেন।

১২৮৪ অব্দে, গওয়াসুদ্দীন বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। এই সময়ে বল্বীনের পুত্র অথচ কৈকোবাদের পিতা কেরা খাঁ তথাকার অধিপতি ছিলেন। গওয়াসুদ্দীন তাঁহাকে ঐ পদে স্থাপিত করিলেন, এবং রাজচিহ্ন ব্যবহারের আজ্ঞা দিলেন। কেরা খাঁ তাহাতে কৃতার্থ হইলেন। কি আশ্চর্য্য, গওয়াসুদ্দীন বল্বীন রাজার দাসানুদাস হইয়া, তাঁহার পুত্রের এই সম্মান করিলেন।

ঐ সময়ে সোনার গাঁ সংজ্ঞাতে খ্যাত ঢাকা সহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। গওয়াসুদ্দীন তাহাও নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে, জুনা খাঁ তাঁহার সম্মানার্থ এক কাষ্ঠময় শিবির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। গওয়াসুদ্দীন তথায় উপবিষ্ট হইলে, ঐ

শিবির ভগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে তিনি ও তাঁহার আর এক পুত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যাপার দৈবায়ত্ত ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু জুনা খাঁ তৎকালে ঐ শিবিরমধ্যে ছিলেন না, তাহাতে অনেকে এই অনুমান করিয়াছেন রাজ্যলোভে পিতার মৃত্যু বাসনা করিয়া তিনি এই শিবির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ তোগলক।

হিং ৭২৫ | খৃঃ ১৩২৫ | কং ৪৪২৬

গয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর, জুনা খাঁ সাহমহম্মদ নাম ধারণ পূর্ব্বক মহা ধুমধামে রাজ্যারম্ভ করিলেন, এবং আপনার বন্ধুবান্ধব ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে অনেক ধন ও বৃত্তি দান এবং অনেক অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইল। যে হেতু এই সকল কর্ম্মে অনেক অর্থ ব্যয় হইল, তাঁহার পূর্ব্বে কোন রাজা এমন ব্যয় করেন নাই। ফলতঃ তৎকালে যে সকল রাজা ছিলেন জুনা খাঁ তাঁহাদিগের মধ্যে অতি বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি অতি সুবক্তা, এবং গ্রীক দেশীয় ন্যায়াদি শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার যে সকল পত্রাদি অদ্যাপি আছে তাহা অতি মনোহর। চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরক্তি ছিল। ইহা ভিন্ন তিনি মহা

পানে সম্যক্‌রূপ বিরত ছিলেন, এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক কোন অনুষ্ঠানে ত্রুটি করিতেন না। যুদ্ধ বিগ্রহেও তাঁহার বিশেষ সামর্থ্য ছিল।

কিন্তু এই সকল উত্তম উত্তম গুণ থাকিয়াও কার্য্যকালে তাঁহার জ্ঞানের যে প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে একপ্রকার উন্মত্ত বলা যাইতে পারে। তিনি অতিশয় লোভপরতন্ত্র ছিলেন। এবং মনে মনে বাসনা করিয়া ছিলেন যে আর আর সকল রাজ্য আপনার অধিকার-ভুক্ত করিবেন, এবং নিতান্ত অদূরদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, স্বোপার্জ্জিত রাজ্য সকলও হস্তান্তর হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার রাজ্যকালে সর্ব্বদা বিদ্রোহাদি হইত, তাহাতে প্রজাদিগের দুর্গতি, রাজকোষের ধনক্ষয়, ও সময়ে২ দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের সমূহ অমঙ্গল হইয়াছিল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

তিনি রাজত্বের আরম্ভেই দক্ষিণ দেশ জয় করিলেন, পরে ভারতবর্ষে ধন প্রাপ্তির কোন উপায় না দেখিয়া, পারস্য দেশ অধিকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তজ্জন্য অসংখ্য সৈন্য নিযুক্ত হইল। ইহাদিগের বেতন ও যুদ্ধের অন্যান্য ব্যয়ে তাঁহার ধনাগার প্রায়

শূন্য হইয়া পড়িল, তাহাতে তাহাদিগকে বেতন দিতে অক্ষম হইলেন। সুতরাং ঐ সকল সৈন্যেরা দুর্দান্ত হইয়া প্রজাদিগের গৃহাদি ও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাতে দেশের দুরবস্থার একশেষ হইল, প্রজারা চারিদিগে হাহাকার করিতে লাগিল।

তদনন্তর মহম্মদ ঐশ্বর্য্যশালী চীন দেশ জয় করিবার মানস করিলেন, এবং তজ্জন্য এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিমালয়শিখরস্থ পথ দিয়া তাহাদিকে চীনাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেনাগণ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করিল, তাহাতে নিতান্ত কষ্ট হইল, ও অনেক সৈন্য মারা পড়িল। অবশেষে যখন তাহারা চীন দেশের সীমায় উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাইল তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থ অসংখ্য চীনসেনা প্রস্তুত হইয়া আছে, ইহাতে তাহাদিগের একেবারে দুর্দ্দশা ভঙ্গ হইল। বিশেষ তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্যাদি শেষ হইয়াছিল, এবং সম্মুখে বর্ষা, সুতরাং রণে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহারা সেইখান হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমনকালে চীন সেনারা তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনবরত তাহাদিগকে কাটিতে২ আসিল। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতবাসীরা আক্রমণ করিল। আর বর্ষার জলে পর্ব্বতের পথসকলও জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এই দুর্দৈব, অনাহার

ও পথশ্রান্তিতে অনেক সেনা নষ্ট হইল, অবশিষ্ট যাহারা ফিরিয়া আসিল তাহারাও রাজার কোপগ্রাসে পতিত হইয়া যমালয়গামী হইল।

মহম্মদ চীন রাজ্য জয়ের আশাতে এইপ্রকার নিরাশ হইয়া ধনলাভের আর এক অভিসন্ধি স্থির করিলেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি শুনিয়া ছিলেন চীন দেশীয় রাজারা ধাতুর পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব তিনিও আপন রাজ্যে সেই ব্যবহার প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। বিদেশীয় মহাজনেরা এ কাগজ লইতে অস্বীকার করিলেন। স্বদেশেও তাহা চলিত হইল না। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়াদি স্থগিত হইয়া দিন দিন প্রজাদিগের দীনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং রাজস্ব সংগ্রহেরও ব্যাঘাত জন্মিল। রাজস্ব অভাবে রাজা অন্যান্য প্রকার কর স্থাপন করিলেন। প্রজাগণ এই সকল কর দিতে অক্ষম হইয়া দেশত্যাগী হইতে লাগিল। কৃষকগণ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গিরিগহ্বরে ও অরণ্যাদিমধ্যে থাকিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা দিনপাত করিতে লাগিল। প্রজাগণের পলায়নে মহম্মদ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যেপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিলেন তাহা আরও ভয়ানক। প্রজারা যে বনমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তিনি সৈন্যদ্বারা তাহা বেষ্টন করা-

ইতেন, এবং বন্য পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই প্রকারে অসংখ্য প্রাণী নষ্ট হইল, এবং কৃষক অভাবে শস্য উৎপন্ন না হওয়াতে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

এবম্বিধ অত্যাচারে নানাস্থানে নানাবিধ উপদ্রব হইতে লাগিল। পঞ্জাব, মালব, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ রাজ্যের সুবাদারেরা রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া আপনারা রাজপদ গ্রহণ করিলেন। এই সকল বিদ্রোহ দমন জন্য মহম্মদ স্বয়ং অস্ত্রধারী হইয়া পঞ্জাব ও মালবের শাসনকর্ত্তাদিগকে বলে বশীভূত করিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিতে পারিলেন না। ঐ দেশ তৎকালাবধি দিল্লীশ্বরের হস্তান্তরিত হইয়া বহুকাল স্বাধীন রহিল, তাহার পর আকবর শাহ তাহা পুনর্ব্বার আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ রাজ্যেও ঐ প্রকার রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। মহম্মদ তন্নিবারণ জন্য আপনি গমন করিলেন, কিন্তু হঠাৎ মহামারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, তাহাতে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগিরিতে আসিলেন। দেবগিরি অতিরম্য স্থান, তদবলোকনে তিনি অত্যন্ত মোহিত হইলেন, এবং তথায় আপন রাজপাট করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, রাজধানীর

নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া, দিল্লীনগরস্থ সমস্ত প্রজাদি-
গকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা সপরিবারে যাইয়া ঐ
নগরে বাস করে, নতুবা তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড হইবে।
প্রজারা কি করে তাহাই করিল। ইহাতে দিল্লী
নগর লোকশূন্য হইল, অথচ দেবগিরি সুশোভিত হইল
না। কিছু দিন পরে সুলতানের সুবাদার রাজ-প্রতি-
কূলাচারী হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্বয়ং ঐ রাজ্যে
গমন করিতে হইল। তথা হইতে তিনি দিল্লী নগরে
প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহার প্রজাগণ স্বদেশ দর্শনে পুলকিত হইয়া
পুনর্ব্বার দৌলতাবাদে গমনের আশঙ্কায়, তাঁহার কর্ম্ম
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সুতরাং মহম্মদ তখন
দেবগিরি গমনে ক্ষান্ত হইলেন, এবং দিল্লীতে রাজ-
ধানী পুনঃ স্থাপনের অভিপ্রায়ে, দেবগিরি হইতে
প্রজাদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন। দুই
তিন বৎসর পরে, আবার তাঁহার অভিপ্রায় হইল
দেবগিরিতে রাজধানী করিবেন, তাহাতে সমস্ত
প্রজাগণকে দেবগিরি যাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিছু-
কাল পরে দিল্লীতে পুনর্ব্বার আসিবার বাঞ্ছা হইল,
তাহাতে পুনর্ব্বার প্রজাদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা
দিলেন। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ গমনাগমনে প্রজা-
গণের অপরিমিত ক্লেশ ও অর্থনাশ হইল, বিশেষতঃ

শেষে আসিবার সময়ে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে প্রজাগণ কেবল ক্লেশ পাইল এমত নহে, সহস্র সহস্র মহাপ্রাণী আহার অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাদিগের শবে পথ ঘাট পরিপূর্ণ হইল।

মহম্মদ যৎকালে দক্ষিণ রাজ্যে গমন করেন তখন পাঠানেরা পঞ্জাব দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা প্রস্থান করিলে গোরখা জাতীয়েরা ঐ রাজ্য বিনাশ করিয়া লাহোর রাজধানী অধিকার করিল।

ঐ সময়ে কর্ণাট ও তৈলঙ্গের রাজারাও স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অস্ত্রধারী হইলেন। কর্ণাটের রাজা বল্লালবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করিলেন। বল্লাল বংশীয় রাজারা বিজয় নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৈলঙ্গের রাজারা অরঙ্গল পুনরধিকার করিয়া মুসলমানদিগের তাবৎ দুর্গরক্ষক সেনাদিগকে দূরীভূত করিলেন।

এই প্রকার আর আর অনেক স্থানে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মহম্মদ কোন্ কোন স্থানের বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু গুজরাটে ভারি উপদ্রব উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে অনেক মোগল সৈন্য ছিল, তাহারা মহম্মদের রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া রাজ্যাপায়

অস্ত্রধারণ করিল। মহম্মদ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং গুজরাটে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে মোগলেরা গুজরাট পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া দৌলতাবাদ নগর অধিকার করিল। মহম্মদ কি করেন, তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ঐ স্থানে গমন করিলেন। গমন করিতেই গুজরাটে পুনর্ব্বার উপদ্রব আরম্ভ হইল। ঐ সংবাদ পাইয়া তিনি এক জন সেনাপতিকে দৌলতাবাদে রাখিয়া আপনি গুজরাটে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিতেই তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের হস্তী অশ্ব প্রভৃতি অনেক দ্রব্যাদি লুঠ করিল। তথাপি মহম্মদ গুজরাটে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহকারী প্রজারা তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সিন্ধু দেশের রজপুত রাজাদিগের শরণাগত হইল। মহম্মদ তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে সংবাদ পাইলেন দেবগিরির রাজা, হোসন গঙ্গু নামক এক ব্যক্তিকে ঐ রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার সাহায্যে বিদ্রোহকারী প্রজা সকল মহম্মদের জামাতাকে বধ করিয়া তাবৎ দক্ষিণ রাজ্য পুনরধিকার করিয়াছে; অধিকন্তু মালবদেশীয় শাসনকর্ত্তা তাহাদিগের পক্ষ হইয়াছেন।

এই সকল সংবাদ পাইয়া মহম্মদের ক্রোধ হইল

এক রাজ্য উত্তমরূপে শাসিত না করিয়া অপর রাজ্য রক্ষা করা সদ্বিবেচনার কর্ম্ম নহে। অতএব তিনি প্রথমতঃ গুজরাট শাসন করা শ্রেয়ঃ জানিয়া, তৎকালে দক্ষিণ রাজ্যে গমন না করিয়া, যে সকল মোগলেরা সিন্ধু রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল তাহাদিগের দমনার্থ ঐ রাজ্যে গমন করিলেন। তৎকালে মহম্মদ শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, সিন্ধু গমনে তাঁহার পীড়া রদ্ধি

খ্রিঃ ১৫২ } হইল, তথাপি তিনি সিন্ধু অভিমুখে
গৃ ১৩৪১ } গমন করিলেন, কিন্তু ঐ দেশে
কং ৪৪৫০ }

উপনীত না হইতে২ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মোগলেরা দক্ষিণ রাজ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া, ইসমেলী নামক পাঠান জাতীয় আপনাদিগের এক প্রধানকে রাজা করিল। ঐ ব্যক্তি কিছুকাল রাজ্য করিয়া জাফর খাঁ নামক তাঁহার এক দক্ষ সেনাধ্যক্ষকে রাজ্যার্পণ করিলেন। এই ব্যক্তিও পাঠানজাতীয়, তাহার পূর্ব্ব নাম হোসেন। তিনি পূর্ব্বে দিল্লীনগরস্থ এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। এক দিবস ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে ভূমিমধ্যে কতক অর্থ পাইয়া ব্রাহ্মণকে দেন। ব্রাহ্মণ তদ্বিবরণ রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা হোসেনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শত অশ্বের অধ্যক্ষ করেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া দেখেন হোসেন ভবিষ্যতে রাজ্যেশ্বর

হইবে। অতএব তিনি তাহাকে বলেন যদি তুমি রাজা হও তবে আমাকে তোমার মন্ত্রী করিও। হোসেন বাহাদুর হইয়া রহিলেন। পরে উমদেল খাঁ তাঁহাকে রাজ্য অর্পণ করিলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদ দিলেন, এবং স্বয়ং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন. তাহাতে ঐ রাজ্য ব্রাহ্মণীয় নামে খ্যাত হইয়াছে।

মহম্মদ যে সকল নূতন কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনই প্রধান। এই কল্পনা বড় মন্দ বলা যায় না, কিন্তু মহম্মদ ক্ষণিক-বুদ্ধি ছিলেন, যখন যাহা মনে উদয় হইত তখনই তাহা করিতে চাহিতেন। ইহাতে ঐ কল্পনা সিদ্ধ হইতে পারে নাই। সুতরাং প্রজাদিগের অত্যন্ত দুর্গতি এবং দিল্লী নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।

মহম্মদের ক্ষণিক বুদ্ধির আরও দুই একটি কথা লিপিবদ্ধ আছে। যখন রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষাদি নানা দুর্ঘটনা হইতে লাগিল, তখন তিনি মনে করিলেন বোগদাদের রাজাদিগের স্থানে তাঁহার রাজ-সনন্দ লওয়া হয় নাই, সেজন্য এই সকল দুর্ঘটনা হইতেছে। অতএব ঐ পদধারী যে রাজা তখন মিসর দেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ আনাইলেন, এবং তাঁহার যে সকল পূর্ব্ব পুরুষেরা

সনন্দ না লইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, রাজতালিকা হইতে তাঁহাদিগের নাম উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রমত্ত বুদ্ধির আর এক দৃষ্টান্ত এই, দক্ষিণ রাজ্যে যাইয়া তাঁহার দন্তপীড়া হইয়াছিল, তাহাতে একটী দন্ত ভগ্ন হওয়াতে তিনি সেই দন্তটীকে মহা ধুমধামে গোর দেন এবং তাহার উপর এক প্রশস্ত মসজীদ নির্ম্মাণ করেন।

এই প্রকার তাঁহার অনেক কর্ম্মে উন্মত্ততার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। তাঁহার দৌরাত্ম্যও অতিশয় ছিল, এই জন্য তাঁহার রাজত্বকালে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আপন ক্ষমতাতে অনেক বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্ব আরম্ভে এই ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের যত অধিকার ছিল, তাঁহার মৃত্যুকালে তাহার অনেক হস্তান্তরিত হইয়াছিল। যে সকল রাজ্য হস্তান্তর হয় নাই, তাহাতেও মুসলমানদিগের বড় প্রভুত্ব ছিল না। মহম্মদ সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

ফিরোজ তোগলক।

হিং ৭৫২
খৃঃ ১৩৫১
কং ৪৪৫৩

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যগণ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে প্রবল মোগলেরা সকল রাজকর্ম্ম

প্রভুত্ব করিবার বাঞ্ছা করিল, কিন্তু পারিল না, যেহেতু এই দেশীয় প্রধানেরা একত্র হইয়া মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে রাজা করিলেন।

ফিরোজ তৎকালে সিন্ধু রাজ্যে ছিলেন, ঐ রাজ্য সুস্থির জন্য কতক সৈন্য রাখিয়া তিনি সিন্ধু নদীর তট দিয়া আগে আসিয়া, দিল্লীনগরে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে আসিতেই তদ্দেশস্থ লোকেরা এক গোল তুলিল যে মহম্মদের ঔরসজাত এক সন্তান আছেন তিনি রাজা হইবেন, ফিরোজ রাজ্য পাইবেন না; কিন্তু তাহারা ফিরোজকে আটক করিতে পারিল না, তিনি অস্ত্রবলে রাজা হইলেন।

১৩৫৪ অব্দে ফিরোজ শাহ বঙ্গ দেশ পুনরধিকার জন্য যাত্রা করিলেন। তৎকালে খাঁ এলাহিম বঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি ফিরোজের আগমন সংবাদ পাইয়া ঢাকার উত্তরে একডালার দুর্গে সসৈন্যে থাকিলেন। ফিরোজ শাহ মালদহের সান্নিধ্যে পাণ্ডুয়া দেশ অধিকার করিয়া একডালাতে যাত্রা করিলেন, এবং অনেক দিন অবধি ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া থাকিলেন। পরে বর্ষা আরম্ভ হইলে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন, বঙ্গ দেশ পুনর্জয় করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ দেশীয় রাজারা ফিরোজ

সাহকে দূতদ্বারা ভেট পাঠাইলেন। ফিরোজ সাহ তাহা গ্রহণ করিলেন, ইহাতে এক প্রকার ঐ দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। এলাইসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর সাহ বঙ্গদেশের রাজা হইলে,

খৃং ৭৬৭
খৃ ১৩৫৬

ফিরোজসাহ পুনর্ব্বার তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অধিকার করিতে না পারিয়া, সিকন্দরের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। তদবধি বঙ্গদেশ একেবারে স্বাধীন হয়।

এই ব্যাপারের কয়েক বৎসর পরে (৭৭৩ অব্দে) তিনি সিন্ধু ও গুজরাট প্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন। তদনন্তর আর বড় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হয় নাই। তাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে দেশহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া, ব্যবস্থাদি সংশোধন ও অন্যায় কর রহিত করিতে লাগিলেন, এবং সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড কিম্বা দৈহিক যন্ত্রণা বা অঙ্গহীন করিয়া হত্যার যে নিষ্ঠুর নিয়ম ছিল তাহা একেবারে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কঠোর নিয়ম মুসলমানদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ ছিল, অতএব তাহা রহিত করাতে তাঁহার যথেষ্ট গৌরব হইল।

ইহা ভিন্ন দেশের শোভা ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও প্রজাগণের আয়াসসিদ্ধি বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি এক শত আন্য-

ফিরোজ শাহ, ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১৩৮৭ অব্দে, ৮৭ বৎসর বয়সে, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত রাজকর্ম্মে নিতান্ত অক্ষম হইয়া, মন্ত্রীকে সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া অহরহঃ অন্তঃপুরে বাস করিতেন, তথায় কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। কেবল মন্ত্রী গমনাগমন করিতেন, তাহাতে তিনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীরুদ্দীনকে সংহার করিয়া আপনি রাজা হইবার ষড়যন্ত্র করিলেন। নসীরুদ্দীন তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কোন কৌশলে অন্তঃপুরে পিতার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিলেন। তাহা শুনিয়া ফিরোজ শাহ তাঁহাকেই রাজা করিলেন। কিন্তু নসীরুদ্দীন রাজকর্ম্মে নিতান্ত অনিপুণ ছিলেন, এজন্য তাঁহার দুই পিতৃব্য-তনয় বৃদ্ধ রাজাকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নসীরউদ্দীন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যস্থিত সারমোর পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তখন তাঁহার পিতৃব্যতনয়েরা প্রকাশ করিলেন যে ফিরোজ শাহ তাঁহার পৌত্র গয়াসুদ্দীনকে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎ কাল পরে ফিরোজ শাহ, ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

গয়াসুদ্দীন তোগলক, দ্বিতীয়।

হিঃ ৭৯১
খৃ ১৩৮৯
কং ৪৪৯০

গয়াসুদ্দীন তোগলক উপরিউক্ত দুই অমাত্য কর্ত্তৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু রাজা হইয়াই তাহাদিগেরই সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পাঁচ মাস অতীত না হইতে হইতে তাঁহারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বধ করিলেন।

আবুবেকর তোগলক।

হিঃ ৭৯২
খৃ ১৩৮৯
কং ৪৪৯০

গয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর আবুবেকর নামে ফিরোজ সাহের আর এক পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এক বৎসর রাজ্য করিলে পর, নসীরুদ্দীন পর্ব্বত হইতে রণক্ষেত্রে আসিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে আবুবেকর প্রথমতঃ জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পরাজিত হইলেন, তাহাতে নসীরুদ্দীন তাঁহাকে রুদ্ধ বন্দী করিয়া রাজ্যাধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে সরবর রায় নামক এক জন হিন্দু রাজা নসীরুদ্দীনের পক্ষ ছিলেন, এবং মিবার দেশীয় রজপুত জাতীয়েরা আবুবেকরের সহায়তা করিয়াছিল। রাজসেনাগণ নসীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, এই জন্যে তিনি রাজা হইয়া আজ্ঞা দিলেন তাহারা দেশান্তরিত

হয়। এই আজ্ঞা হইলে তাহাদিগের অনেকে আপনা-দিগকে হিন্দু পরিচয় দিয়া রাজ্যে থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা হিন্দুভাষা উত্তমরূপ উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহাতে তাহাদের ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া তাহারা দেশান্তরিত হইল।

নসীরুদ্দীন তোগলক।

নসীরুদ্দীন নিতান্ত অক্ষম পুরুষ ছিলেন, এজন্য তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের কোন সুশৃঙ্খলা ছিলনা, এবং বিদেশীয় রাজারা তাঁহাকে তাদৃশ সম্মান করিতেন না। গুজরাটের সুবাদার তাঁহাকে হীনবল দেখিয়া রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিল, এবং যমুনাপারস্থ রাজপুত জাতীয়েরাও রাজ-প্রতিকূলাচারী হইল। নসীরুদ্দীন তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না।

মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক জন হিন্দু এই রাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিনিই রাজকর্ম্ম চালাইতেন, রাজা শুদ্ধি পোত্তলিকের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। অবশেষে মন্ত্রী রাজ অপরাধগ্রস্থ হইলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল।

নসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ৪৫ দিবস রাজত্ব করিয়াই তিনি পরলোক গমন করিলেন তাহাতে তাঁহার

কনিষ্ঠ সহোদর মহম্মদ সিংহাসন আরোহণ করিলেন।

মহম্মদ তোগলক।

মহম্মদ যে সময়ে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি নিতান্ত শিশু, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের রাজত্ব-কালে যে সকল দেশ হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা তাহা পুনঃ প্রাপ্তির কোন চেষ্টা হইল না; যাহা ছিল তাহাও যাইতে লাগিল। তাহার কারণ, গুজরাটাধ্যক্ষ মোজাফর খাঁ রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া আপনি স্বাধীন হইলেন। এবং দক্ষিণ রাজ্য হস্তান্তর হওনের পর যদিও মালবপ্রদেশে মুসলমানদিগের প্রভুত্ব পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও রহিল না, ঐ দেশ একেবারে স্বাধীন হইল। [illegible] খন্দেশ প্রদেশও সেই প্রকার স্বাধীন হইল। এবং খাজা জাহান নামে রাজমন্ত্রী জোয়ানপূরের শাসনকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনিও সময় বুঝিয়া ঐ রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। অধিকন্তু রাজধানীতে লোকদিগের মধ্যে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি, যুদ্ধ দ্বন্দ্ব, ও কাটাকাটি আরম্ভ হইল। রাজ্যের অপর অপর স্থানে সেই প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ হইতে লাগিল। যেখানে তাহা না হইল তথায়

লোকেরা কোন পক্ষে না থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে অপরের সর্ব্বনাশ দেখিতে লাগিল।

রাজ্যের এই দুরবস্থার সময়ে অকস্মাৎ আর এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। তৈমুর লঙ্গ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভারতরাজ্য ছারখার করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য হইল না তাঁহার পথাবরোধ করেন, তাঁহার বিবরণ পশ্চাত্তে লেখা যাইতেছে।

তৈমুরলঙ্গ সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং আপনাকে জঙ্গিস খাঁর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কথা যথার্থ হউক, বা না হউক, তিনি জঙ্গিস খাঁর বংশীয় খোরাসানের রাজাদিগের এক জন সেনাপতি ছিলেন। উক্ত কর্ম্মে থাকিয়া তিনি অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে রাজা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দেন। ইহার চারি বৎসর পরে তৈমুর রাজপ্রভুত্ব ত্যাগ করেন। এবং রাজার মৃত্যুর পর তিনি খোরাসান অধিকার করিয়া সমরকন্দে রাজধানী করেন। তদনন্তর অপর ২ রাজাদিগকে দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য হরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি পারস্য দেশ ও মহাতাতার জয় করিলেন। পরে, পূর্ব্ব তাতার, জার্জিয়া, মেসপোতেমিয়া, ও রুষের কিয়দংশ এবং সাইবিরিয়া দেশ তাঁহার লোভমুখে পড়িল।

তিনি ক্রমে ক্রমে এই সকল দেশ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে প্রজাগণের ক্লেশের একশেষ হইল। তিনি এই সকল দেশ দগ্ধ ও লুঠপাট করিয়া একাকার করিলেন। কোন রাজা তাঁহার সহিত অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেন না, সকলেই তাঁহার প্রবল পরাক্রমে নতশির হইলেন। মনুষ্যহত্যাতে তাঁহার কিছুমাত্র দয়া মমতা ছিলনা। কথিত আছে তিনি নরমুণ্ড ছেদন করিয়া কৌতুকার্থ স্তম্ভ প্রস্তুত করাইতেন। এবম্বিধ দৌরাত্ম্য দ্বারা তিনি এক প্রকার সর্ব্বজয়ী হইলেন, এবং তাঁহার অত্যাচার ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের তাবল্লোক কম্পান্বিত হইল।

যখন পশ্চিমাঞ্চলে তৈমুরলঙ্গের এই প্রকার একাধিপত্য, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রাজাদিগের পরস্পর বিবাদে ভারতবর্ষ অতি বিশৃঙ্খল হইয়াছে। অতএব ভারতবর্ষ জয় করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি আপন পৌত্র পীর মহম্মদকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

হিং ৮০০ খৃ ১৩৯৮ সং ১৪৫৫	পীর মহম্মদ, সিন্ধু পার হইয়া উচ দিয়া মুলতানে আসিয়া ঐ স্থান

বেষ্টন করিলেন। কিন্তু ছয় মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া তাহা অধিকার করিতে পারিলেন না। তৈমুর লঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং ৯২ সম্প্রদায় দুর্জ্জয় যোদ্ধা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হিন্দুকুশ দিয়া কাবুলে

উপনীত হইলেন। তথা হইতে, সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে সেকন্দর শাহ সিন্ধু পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানে, নৌকাভাবে, কাষ্ঠের ভেলাতে সৈন্য পার করিলেন। তথা হইতে একেবারে বিতস্তা, অর্থাৎ একণকার ঝিলম, নদী পর্য্যন্ত আসিলেন। পরে ঐ নদীর ধার দিয়া তুলম্বা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পথিমধ্যে যত দেশ সম্মুখে পড়িল সকল লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিলেন। পরে তুলম্বায় আসিয়া যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া তত্রস্থ লোকদিগের নিকট অনেক অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের দুঃখের অবসান হইল না, প্রচুর ধনাশা নিবৃত্তি হইলে সেনাগণের পিপাসা বৃদ্ধি হইল, তাহারা প্রজাগণকে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিল।

এই প্রকার দেশ লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে তৈমুরলঙ্গ শতদ্রু নদী লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পীর মহম্মদ মুলতান প্রদেশ জয় করিলেন, কিন্তু বর্ষাভিশয্যে তাঁহার অশ্বসকল হত হইল, তাহাতে তিনি অপার্য্যমাণে দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে থাকিলেন। অনন্তর তৈমুরলঙ্গ শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি দুর্গ রক্ষার্থে কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া তাঁহার সহিত মিলিলেন। তৈমুরলঙ্গ তথা হইতে আজুদিনে আসিলেন, তখন তাঁহার

সহিতে যুদ্ধ অস্ত্রধারী রুকনদ্দীনের সৈন্য মাত্র আসিল, অবশিষ্ট সৈন্য সকল পশ্চাতে থাকিল। আজুদিনের লোকেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি করিল না; এবং ঐ স্থানে এক মুসলমান মহাপুরুষের গোরস্থান ছিল, এজন্য তিনি তদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া তাহনাতে গমন করিলেন, এবং দুর্গে যে সকল লোক প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। ইহা দেখিয়া তদ্দেশস্থ লোকেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকারের প্রস্তাব করিল। তৈমুরলঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়াও এই আজ্ঞা দিলেন, পীর মহম্মদের সহিত যে সকল লোক যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে সমর্পণ করা যায়। এই অন্যায় আজ্ঞাতে ঐ সকল লোক বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার অস্ত্রধারী হইল, এবং আপনাদিগের অপত্য কলত্রাদিকে সংহার করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে সমরশায়ী হইল। তৈমুর এই সকল লোকের আচরণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তদ্দেশস্থ তাবল্লোককে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তদ্দেশের তাবৎ নগর অনলসাৎ করিলেন।

এই ব্যাপারের পর তৈমুরলঙ্গ সামানাতে যাত্রা করিলেন, এবং পথিমধ্যে সরস্বতী প্রভৃতি যে সকল নগরাদি সম্মুখে পাইলেন তাহা লুণ্ঠন ও সংহার

লোকদিগকে বিনাশ ও রণবন্দী করিয়া লইয়া চলি-
লেন। এই স্থানে সামানী পর্যন্ত গমন করিলে
তাঁহার অবশিষ্ট সেনাগণ আসিয়া তাঁহার সহিত
মিলিল, তখন তিনি দিল্লাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
সামানী হইতে দিল্লী পর্যন্ত যত নগর ছিল তাহার
কোন স্থানে জনপ্রাণী ছিল না। তাঁহার আগমন
সংবাদে সকল লোক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া পলা-
য়ন করিয়াছিল, সুতরাং এই সকল স্থানে অধিক উপ-
দ্রব হইল না। কিন্তু দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার
সেনাদের আহারীয় দ্রব্যের অনাটন হইয়াছিল,
তাহাতে অন্য উপায় অভাবে তিনি প্রায় লক্ষ রণ-
বন্দীর প্রাণ বধ করিলেন। কোন২ গ্রন্থকার লেখেন
এই সকল লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাছে অস্ত্রধারণ
করে এই আশঙ্কায় তিনি পোনের বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক
তাবৎ রণবন্দীকে খড়্গসাৎ করিয়াছিলেন। কি নিষ্ঠু-
রতা!

যখন তৈমুরলঙ্গ দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন,
তখন দিল্লীনগরে ৪০,০০০ পদাতিক এবং ১০,০০০
অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র ছিল। এই সৈন্যগুলিন লইয়া
মহম্মদ তোগলক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তৈমুরল-
ঙ্গের সহিত যুদ্ধ করেন এমত সাধ্য কি, সুতরাং তিনি
দুর্গের মধ্যে থাকিলেন। তৈমুর দেখিলেন দুর্গ আক্র-

বশ করিয়া তিনি তাঁহার কিছু করিতে পারিবেন না, অতএব তাঁহাকে দুর্গ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করাই পরামর্শ, তদ্ভিন্ন জয়ের আর কোন উপায় নাই। এই বিবেচনা করিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্য দিল্লীশ্বরের সম্মুখে পাঠাইলেন। ইহারা স্থানে২ সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া এমন ভাবে রহিল যে তাহাদিগকে দেখিয়া সকলে এমন বোধ করিতে পারে তাহারা যুদ্ধে নিতান্ত অনিপুণ, রাজপুতেরা একবার বাহির হইলেই তাহারা পলায়ন করে।

মহম্মদ তাহাদিগের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া দুর্গের যাবতীয় সৈন্য লইয়া প্রান্তরে যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন, এবং হস্তীগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সম্মুখে খাড়া করিয়া দিলেন। মোগল অশ্বারোহী সেনারা সময় বুঝিয়া অকস্মাৎ ঐ সকল হস্তীর উপর পড়িল, তাহাতে অনেক হস্তিপ একেবারে মরিল। হস্তিপ মারা পড়িলে রক্ষকহীন হস্তী সকল ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল, তাহাতে আপনাদের সেনাশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইল। এই দুর্দ্দৈবকালে দুর্দ্দম মোগল সেনারা তাহাদিগের উপর একেবারে চাপিয়া পড়িল, তাহাতে মুসলমানেরা ভীতভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মোগলেরা তাহাদিগকে সংহার করিতে ২ দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। মহ-

সকলে সংহার এবং গৃহে অগ্নিদান করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুদিগের খড়্গামুখে পড়িতে লাগিল। নগরের মধ্যে ভারি কোলাহল উঠিল।

তৈমুর এইসকল ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, পরে যখন নগরের কোলাহল কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা দৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন তিনি তাহা জানিতে পারিয়া আজ্ঞা দিলেন দিল্লীনগর একেবারে লুটকর, এবং আবাল বৃদ্ধ কাহাকেও জীবিত রাখিও না। সেনাগণ একে জয়ে উন্মত্ত, তাহাতে এই আজ্ঞা পাইল, নগরে প্রবেশ করিয়া দুই চক্ষে যাহাকে দেখিল তাহাকে সংহার এবং যাহার যাহা পাইল তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। বালক বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোক কাহাকে ছাড়িল না। এই কাণ্ড পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত চলিল, তাহাতে দিল্লীতে এক প্রাণীও জীবিত রহিল না. নগরস্থ সকল পথ শবে রুদ্ধপ্রায় হইল। ধনী দুঃখী যাহার যাহা ছিল সকলই শত্রুর উদরে পড়িল, এবং সুশোভিত দিল্লীনগর শ্মশানের ন্যায় হইল।

তৈমুরের ধনাশা ও শোণিতপিপাসা এই প্রকারে নিবৃত্ত হইলে, ষোড়শ দিবস পরে তিনি শিবির উত্তোলন করিয়া মিরটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত যে লুণ্ঠিত অর্থ চলিল তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। দিল্লীনগরে মুসলমানদিগের রাজধানী হইয়া

অবধি দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তিনি একেবারে ঝাঁটাইয়া দিয়া লইয়া চলিলেন। মিরটে যাইয়াও তিনি ঐ দেশ সেই প্রকার দগ্ধ ও তদ্দেশবাসীদিগকে খণ্ডাসাৎ করিলেন। তৎপরে গঙ্গা পার হইয়া হিমালয়ের সান্নিধ্যে হরিদ্বারে যাত্রা করিলেন। গমন সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের যে সকল নগর সম্মুখে পাইলেন তাহাও পূর্ব্বরূপ দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিলেন। তদনন্তর পার্ব্বতীয় পথ দিয়া জম্বুতে যাইয়া সিন্ধু পার হইয়া সমরকন্দে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষে যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি প্রস্থান করিলেন। তিনি যে এই দেশ অধিকার করিলেন তাহার কোন চিহ্ন রহিল না, তিনি যে সকল রাজ্য উৎসন্ন করিয়া যান, তাহাই তাঁহার আগমনের চিহ্নস্বরূপ রহিল, এবং তাঁহার গমনান্তে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অরাজকত্ব আরো বৃদ্ধি হইল।

তৈমুর, প্রত্যাগমন কালে খজর খাঁ নামে তাঁহার এক সেনাপতিকে মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খজর খাঁ তাঁহার গমনান্তে তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত ও খুতবা পাঠ করাইতে লাগিলেন।

তৈমুরের প্রত্যাগমনের পর দুই মাস পর্য্যন্ত দিল্লী

নগরের সিংহাসন শূন্য ছিল, তাহাতে দিল্লীর অধীন যাবতীয় প্রদেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং দিল্লীর নিকটস্থ রাজারা সময় পাইয়া সকলে স্বাধীন হইতে লাগিলেন। মহম্মদ তোগলক রণে পরাঙ্মুখ হইয়া, গুজরাট প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, গুজরাটাধিপতি তাঁহাকে সমাদর করেন নাই, এজন্য তিনি মালব-দেশীয় রাজার শরণাগত হইয়াছিলেন। তৈমুরের প্রস্থানের পর, তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কোন সামর্থ্য ছিল না, এনিমিত্ত তাঁহার সেনাপতি একবাল-খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়া সকল রাজকর্ম করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তাঁহার হস্তে সকল রাজ্য সমর্পণ করিয়া বৃত্তিভোগীর ন্যায় কান্যকুব্জে থাকিলেন।

একবাল খাঁ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া প্রতিকূলাচারী রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অনেক রাজাকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু তৈমুরের প্রতিনিধি খজর খাঁর সহিত বল প্রকাশ করিতে

খৃ ১৪০৫
সং ৪৫০৭

যাইয়া শমনালয়ে গমন করিলেন। তখন মহম্মদ কান্যকুব্জ হইতে দিল্লী নগরে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

মহম্মদের প্রত্যাগমনের পর খজর খাঁ দুই বার

রণসজ্জায় দিল্লী নগরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ নগর হইতে বাহির না হইয়া শিবিরমধ্যে থাকিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। মহম্মদ বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর, হিজরী ৮১৪ অব্দে, (খৃ ১৪১২, কং ৪৫১৪) পরলোক গমন করেন। সেই অবধি তোগলক বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব শেষ হয়।

মহম্মদের মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ লোদী দিল্লী নগরের রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চদশ মাস অতীত না হইতে হইতে খিজর খাঁ, ষাইট সহস্র অশ্বারোহী (হিং ৮১৭, খৃ ১৪১৪) সৈন্য সমভিব্যাহারে, পুনর্ব্বার দিল্লী নগর আক্রমণ, এবং দৌলত খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্য অধিকার করিলেন। খিজর খাঁ সৈয়দ বংশীয় ছিলেন, অতএব তাঁহার রাজ্যকালাবধি সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্যারম্ভ গণিত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৈয়দবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

খজর খাঁ।

এই বংশীয় চারি জন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারা, হিং ৮১৭ অবধি ৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ বৎসর রাজ্য করেন। খজর খাঁ এই বংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ। তিনি দিল্লীনগর অধিকার করণানন্তর স্বনামে রাজত্ব না করিয়া, তৈমুরের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাঁহার নামে রাজ্য ও মুদ্রা অঙ্কিত ও খুতবা পাঠ করাইতে লাগিলেন।

তৈমুরলঙ্গ কর্ত্তৃক দিল্লীনগর বিনষ্ট হইলে পর, ঐ রাজ্যের অধীন যে সকল রাজা ও সুবাদারেরা দিল্লী নগরের অধীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন; খজর খাঁ তাঁহাদিগের সহিত ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক জনকে আপনার বন্দীভূত করিলেন। তিনি, নগর অধিকারের পর, সাত বৎসর অনবরত এই প্রকার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন।

খৃ ১৪২১ } ৮২৪ অব্দে, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
কং ৪৫২৩ } হইলে তাঁহার পুত্র মোবারক সিংহা-
সন আরোহণ করিলেন।

মোবারক।

মোবারক পিতার ন্যায় যুদ্ধদ্বন্দ্বে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। মোবারকের যে সকল শত্রু ছিল, তাহার মধ্যে জসরত খাঁ তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি পর্ব্বতবাসী দস্যু, পর্ব্বতীয় লোক একত্র করিয়া সর্ব্বদা পঞ্জাব রাজ্যে দৌরাত্ম্য করিত। রাজসেনাগণ যুদ্ধার্থ গমন করিলে পর্ব্বতশিখরে পলায়ন করিত, রাজসেনাগণ ফিরিয়া আসিলে পুনর্ব্বার রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত; অধিকন্তু বিদ্রোহচারী রাজাদিগের সহিত মিলিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিত। মোবারক ইহাতে নিয়ত অসুখী থাকিতেন।

মোবারক, ১৩ বৎসর রাজ্য করিলে পর, হিজরী ৮৩৭ অব্দে কতকগুলি হিন্দু অকারণ তাঁহাকে বধ করিল। মোবারক অতি ধীরস্বভাব ছিলেন, এবং কখন ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য কিছুই ছিল না, তাহাতে তিনি রাজ্য বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। রাজ্য যে অবস্থায় পাইয়াছিলেন সেই অবস্থায় রাখিয়া যান।

মহম্মদ।

মোবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার হত্যাকারীরা, তাঁহার পুত্র মহম্মদকে সিংহাসন অর্পণ করিল। মহম্মদ পিতার অপেক্ষা বীর্য্যহীন ছিলেন, তাহাতে সরওর উল্‌মুল্‌ক নামে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক হিন্দু তাঁহার মন্ত্রী হইয়া আপনার আত্মীয় হিন্দুদিগকে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্ম প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কুলি খাঁকে আপনার সহকারী করিলেন। ইহাতে প্রধান২ মান্য লোকেরা ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং আপন আপন বিষয়ে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় অস্ত্রধারণ করিলেন। মন্ত্রী এই সকল লোককে দমন করিবার জন্য কুলি খাঁকে সসৈন্যে পাঠাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া বিদ্রোহকারীদিগের সহিত মিলিয়া নগর আক্রমণ করিল। মন্ত্রীর আর আর বন্ধু বান্ধবেরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষের পক্ষ হইল। মন্ত্রী দিন২ হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা নগর রক্ষার্থে বিদ্রোহকারীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া মন্ত্রীকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর কুলি খাঁ রাজমন্ত্রী হইলেন।

এই সময়ে মহম্মদের পিতৃশত্রু জসরত খাঁ পুনর্ব্বার উপদ্রব আরম্ভ করিল, তাহাতে মহম্মদ তাহার সহিত

যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাঁহার যাবতীয় দেশ লুণ্ঠন করিলেন। তদনন্তর রাজ্যে আসিয়া ইন্দ্রিয়সুখে নিতান্ত মত্ত হইলেন, সুতরাং রাজকর্ম্মের শৈথিল্য ও অনিয়ম হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে বিলোলী লোদী নামে এক ব্যক্তি পাঠান মুলতান রাজ্য অধিকার করিলেন। রাজসেনারা প্রথমতঃ তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তর করিল, কিন্তু তৎপরে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন, এবং রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যদি তুমি মন্ত্রীকে সংহার না কর তবে আমি দিল্লী নগর আক্রমণ করিব। বীর্য্য-হীন মহম্মদ তাঁহার সন্তোষার্থে মন্ত্রীকে নষ্ট করিলেন। এই কাপুরুষত্ব দেখিয়া তাঁহার প্রতি সকল লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিল, এবং অনেকে তাঁহার অধীনত্ব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

অতঃপর মালবাধিপতি বহু সৈন্য লইয়া দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ এই বিপদ-কালে বিলোলীলোদীকে আহ্বান করিলেন। বিলোলীলোদী মহম্মদের আহ্বানে সসৈন্যে আসিয়া মালবাধিপতির সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর মালবরাজ এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করি-

লেন। দিল্লীশ্বর সন্ধির জন্য আগ্রহ-যুক্ত ছিলেন, অতএব মালবভূপতি যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন। খিলোজীলোদী দিল্লীশ্বরের এই আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং সন্ধির নিয়ম পালন না করিয়া, রাজার বিনা আদেশে, মালব রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন। দিল্লাধিপতি ঐ জয়ে অতিশয় উল্লাসিত হইয়া খিলোজীলোদীকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন, এবং মুলতানের সুবাদারী কর্ম্মে চিরস্তন নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা দিলেন, তিনি জসরত খাঁকে দমন করেন। খিলোজীলোদী তাহা না করিয়া দিল্লীরাজা হইবার মানসে বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক চারি মাস পর্য্যন্ত ঐ নগর বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

খৃ ১৪৪৪ } মহম্মদ, হিজরী ৮৪৯ অব্দে, পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র
সং ৪৪৪৬ }

আলাউদ্দীন রাজ্যেশ্বর হইলেন।

আলাউদ্দীন।

আলাউদ্দীন পিতা পিতামহ অপেক্ষাও হীনবল ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য আরম্ভ হইলে রাজকর্ম্মের এমন বিশৃঙ্খলা হইল যে সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্য লোপ হইবার সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার

কারণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্যূন ১৩ জন মুসলমান রাজা স্বাধীন হইয়া রাজ্য করিতেছিলেন। ইহাঁরা কেহ দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন না। দিল্লীশ্বর কেবল দিল্লীনগরটী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ৩৪ ক্রোশের মধ্যে যে সকল স্থান ছিল তাহাতে প্রভুত্ব করিতেন, ইহার বহির্ভূত কোন স্থানে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। এবং দিল্লীনগরও ভালমতে শাসন করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু এই আসন্নকালে আলাউদ্দীনের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি রাজকর্ম্মে মনোযোগ না করিয়া বদাউন দেশের রাজোদ্যানের শোভা বর্দ্ধনে একান্তচিত্ত হইলেন। বিলোজীজোদী পূর্ব্বাবধি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অতএব রাজার এই প্রকার রাজকর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখিয়া রাজ্য লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আলাউদ্দীন তখন সভাসদ্‌গণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন এই বিপদে কি করা যায়। তাঁহারা বলিলেন প্রধান মন্ত্রী এই বিপদের মূলীভূত, তাঁহাকে নষ্ট না করিলে রাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই। আলাউদ্দীন এই পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন। মন্ত্রী কোন কৌশলে কারামুক্ত হইয়া বদাউন হইতে দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং প্রভুর সকল

সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাঁহার পরিজনগণকে তাঁহার সদনে বদাউনে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি বিলোলীলোদীকে আহ্বান করিলেন। বিলোলীলোদী সসৈন্যে আসিয়া দিল্লীনগর অধিকার করিলেন। আলাউদ্দীন বিনা-যুদ্ধে তাঁহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাঁহার বৃত্তিভোগী হইয়া বদাউনের উদ্যানে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই অবধি সৈয়দ গোষ্ঠীর রাজ্য শেষ এবং লোদী গোষ্ঠীর রাজ্যারম্ভ হইল।

লোদীবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব।

বিলোলী লোদী।

হিং ৮৫৫, খৃং ১৪৫০, কং ৪৫৫১

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যে বিলোলী লোদী পাঠান দেশীয় মনুষ্য। ইঁহার পিতামহ, ফিরোজ তোগলক রাজার রাজত্ব কালে, মুলতানের সুবাদার ছিলেন। এবং ইঁহার পিতা ও পিতৃব্যেরা সিন্ধু রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দদিগের রাজ্য কালে ইহাঁদিগের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু সৈয়দ বংশীয় মহম্মদ সাহ তাঁহাদিগের পরাক্রমের আতিশয্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার পীড়ন করিতেন, তাঁহাতে

তাঁহারা সিন্ধু ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন; তদনন্তর খিলোজী যোদ্ধা স্বীয় বাহুবলে প্রথমতঃ সর-হন্দ, তৎপরে পঞ্জাব রাজ্য, অধিকার করেন। তদনন্তর তিনি দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

খিলোজী যোদ্ধার সৌভাগ্য বৃদ্ধির আর এক বিবরণ আছে। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যখন খিলোজী সামান্য অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি এক উদাসীনের নিকট গমনাগমন করিতেন। এক দিবস ঐ উদাসীন উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে কহিলেন যদি কোন ব্যক্তি আমাকে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করে, তবে আমি তাহাকে দিল্লী রাজ্য পুরস্কার করি। এই কথা শুনিয়া খিলোজী কহিলেন আমার দুই সহস্র মুদ্রা নাই—ষোল শত মুদ্রা মাত্র আছে, যদি ইহা গ্রহণে অভিরুচি হয় লউন। ইহা বলিয়া তিনি গৃহহইতে ষোল শত মুদ্রা আনাইয়া উদাসীনকে দিলেন। উদাসীন তাহা পাইয়া খিলোজীকে রাজা সম্বোধন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। খিলোজীর বয়স্যেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। খিলোজী কহিলেন ষোল শত মুদ্রা অধিক নহে, যদি তাহা দিয়া রাজত্ব লাভ হয় তাহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় কি আছে; যদ্যপিও তাহা না হয় তথাপি এক জন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বক্তা আশীর্ব্বাদ করিলেন ইহাও পরম লাভ।

বিলোলী লোদী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধু বান্ধব সকলকে অনেক ধন বিতরণ করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত পূর্ব্বাবধি যে সদ্ভাব ছিল সেই ভাবে চলিতে লাগিলেন। কথিত আছে তিনি রাজা হইয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত সিংহাসনারোহণ করেন নাই, বলিতেন সিংহাসনে বসিয়া অধিক ফল কি আছে, রাজ্যের সমস্ত লোকেরা আমাকে রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করে ইহাই যথেষ্ট।

দিল্লী রাজ্যের অধীন যে সকল দেশ হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহা পুনরধিকার করেন, ইহা বিলোলী লোদীর নিতান্ত বাসনা হইল, অতএব তিনি নানা দিকে নানা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পঞ্জাব রাজ্য পূর্ব্বাবধি তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল, তাহা সহজেই বশীভূত হইল। মুলতান রাজ্যে তাঁহার পিতামহ সুবাদার ছিলেন, তাহাও অধিকার করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না। কিন্তু জোয়ানপুর অধিকার করিতে অনেক যুদ্ধাদি হইল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

এই রাজ্য পূর্ব্বে দিল্লীর অধীন ছিল, পরে মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে যখন দিল্লীরাজ্যের অধীন আর আর সকল রাজা দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে লাগিলেন তখন জোয়ানপুরের

রাজপ্রতিনিধি খোজাজাহান রাজপ্রভুত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি দেশের কর্ত্তা হইলেন। তৎপরে তিনি গোরক্ষপুর, ভাইরক, তুয়ার ও বেহার প্রদেশ জয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত পরাক্রম হইল এবং বঙ্গদেশের রাজারা তাঁহাকে কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যখন দিল্লীনগরের পরাক্রম হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, তখন জোয়ানপুরের রাজাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সুতরাং ঐ রাজ্য দিল্লীরাজের চক্ষুঃশূল হইল, এবং যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিতেন তিনিই তাহা জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কোন রাজা তাহা পারেন নাই।

খোজাজাহানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এব্রাহেম শাহ এই রাজ্যে ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। এব্রাহেম মধ্যে ২ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তাঁহার রাজ্যে কোন বিরোধ না থাকে এবং বিদ্যানুশীলনের বৃদ্ধি হয় ইহা তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল। বাস্তবিক তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অতিশয় সুখী ছিল। ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন যে এব্রাহেমের তুল্য বিচক্ষণ রাজা মুসলমানদিগের মধ্যে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। তাঁহার রাজ্যকালে জোয়ানপুরের রাজসভা ভারতবর্ষের মধ্যে অতি শোভাযুক্ত ছিল, ঐ শোভাতে

দিল্লীর রাজসভা একবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। ঐ স্থানে যে সকল অট্টালিকা, সেতু ও পথিকশালের ভগ্নাংশ অদ্যাপি পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় ঐ স্থান পূর্ব্বকালে অতি সুশোভিত ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল।

এব্রাহেমের মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। বিলোলী লোদী দিল্লী রাজ্য অধিকার করিয়া জোয়ানপুর লইবার মানসে মহম্মদ সাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন বিলোলী লোদী ঐ দেশ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। অনন্তর হোসেন খাঁ ঐ রাজ্যের রাজা হইয়া বিলোলী লোদীকে বলিলেন তিনি চারি বৎসর কাল যুদ্ধ না করেন, তাহার পর যাহা হয় করিবেন। এ কথায় বিলোলী লোদী যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন, এবং উভয় সম্মতিতে একখান নিয়মপত্র হইল চারি বৎসরের মধ্যে কেহ যুদ্ধ করিবেন না। তদনন্তর বিলোলী লোদী বিদ্রোহ দমনার্থে পঞ্জাবে গমন করিলেন। হোসেন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ঐ সময়ে দিল্লী নগর আক্রমণ করিলেন। বিলোলী লোদী এই সংবাদ পাইয়া সত্বরে দিল্লীতে পুনরাগমন করিয়া

হোসেন খাঁয়ের সহিত রণারম্ভ করিলেন, কিন্তু জয়াজয় নিশ্চয় হইল না। তাহাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধ স্থগিতের সন্ধিপত্র হইল, তাহাও কোন কার্য্যের হইল না, যে হেতু হোসেন খাঁ পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ হইল, বিলোলী লোদী কিছু করিতে পারিলেন না। তৎপরে ১৪৭৮ অব্দে, সৈয়দ বংশীয় দিল্লীনগরের পূর্ব্বরাজা আলাউ-দ্দীনের মৃত্যু হইলে, বদাঊন দেশে তাঁহার যে বিষয়াদি ছিল হোসেন খাঁ তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ইহাতে পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অবশেষে ইহাধার্য্য হইল যে গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ সকল দেশ জোয়ানপুরভুক্ত এবং তাহার পশ্চিম পারের তাবৎ রাজ্য দিল্লীর অধীন থাকিবে। কিন্তু এই সন্ধি বহু-

হিং	৮৮৩	দিবস রহিল না, পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইল।
খৃ	১৪৭৮	
কং	৪৫৮০	তাহাতে বিলোলী লোদী হোসেন

খাঁকে পরাস্ত করিয়া ঐ রাজ্য আপন পুত্র বার্বেককে দিলেন। জোয়ানপুর রাজ্য ৮০ বৎসরের পর পুন-র্ব্বার দিল্লীভুক্ত হইল। হোসেন খাঁ পরাজিত হইয়া দেশান্তর পলায়ন করিলেন।

এই রাজ্য ভিন্ন বিলোলী লোদী আর আর কয়েক স্থান জয় করিলেন। তাহাতে যমুনার পশ্চিম বুন্দেল-খণ্ড অবধি, উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব্বে বারাণস পর্য্যন্ত

তাঁহার অধিকার হইল। বিলোলীলোদী বিচক্ষণ ও সাবধান ছিলেন, এবং বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ করিতেন। তিনি, হিজরী ৮৯৪ অব্দে, পরলোক গমন করেন।

খৃ ১৪৮৮
কং ৪৫৯০

বিলোলী লোদী জীবিতবান থাকিতে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দরকে রাজসিংহাসন দিয়া, অপর পুত্রদিগকে অন্যান্য রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কর্ম্ম যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই, যে হেতু তাহাতে বিবাদের সূত্রপাত হইল।

সিকন্দর লোদী।

বিলোলী লোদীর মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধানেরা সিকন্দরের রাজ্যাধিকারের প্রতিবন্ধক হইয়া কহিলেন, তাঁহার গর্ব্ভধারিণী স্বর্ণকারের কন্যা, অতএব তিনি রাজা হইতে পারিবেন না। তাঁহার সহোদরেরাও রাজ্যের আশাতে অস্ত্রধারী হইলেন। কিন্তু সিকন্দর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনি সিংহাসন আরোহণ করিলেন, এবং তাঁহার পিতা তাঁহার ভ্রাতৃগণকে যে যে রাজ্য দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও লইয়া আপন রাজ্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। বার্বেক জোয়ানপুরের রাজা হইয়াছিলেন, তিনি সহজে ঐ রাজ্য দিলেন না, তাহাতে সিকন্দর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ঐ

রাজ্য লইলেন, কিন্তু তাহার পর স্বইচ্ছাতে ঐ রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তাহার কারণ—জোয়ানপুরের পূর্ব্ব রাজা হোসেন খাঁ রাজ্যচ্যুত হইয়া বেহার অবধি অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এবং জোয়ানপুর লইবারও চেষ্টায় ছিলেন। অতএব ঐ রাজা তাঁহাকে দিয়া ঐ দেশ রক্ষার দায় হইতে একপ্রকার মুক্ত হইলেন। কিন্তু হোসেন খাঁ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সিকন্দরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সিকন্দর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, অবশেষে বঙ্গ দেশের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত পুনরধিকার করিলেন। তদবধি হোসেন খাঁ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আর কোন চেষ্টা না করিয়া বঙ্গ দেশে যাইয়া নরলীলা সম্বরণ করিলেন।

সিকন্দর তাহার পরেও নিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্যের সীমা বড় বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। সিকন্দর জ্ঞানবান ও শান্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষ ছিল। তিনি যে সকল হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহাতে দেবালয়াদি কিছুই রাখিতে দেন নাই, সকল ভগ্ন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদিগের যোগস্নান ও তীর্থযাত্রা একেবারে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। মথুরাতে যে সকল তীর্থবাসীরা থাকিত তাহাদের নাপিত

পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সকল অত্যাচার দেখিয়া কোন বিজ্ঞ মুসলমান তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে সিকন্দর খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, নরাধম তুই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বৃদ্ধি ইচ্ছা করিস্, জানিস্ না এখনি তোর মুণ্ড ছেদন করিব। ঐ ব্যক্তি সবিনয়ে বলিলেন, মহারাজ আমি পৌত্তলিক ধর্ম্মের বৃদ্ধি ইচ্ছা করি না, কিন্তু প্রজাদিগের নির্যাতন করা রাজার কর্ম্ম নহে। এই কথায় রাজা শান্ত হইলেন।

আর এক সময়ে এক ব্রাহ্মণ ও এক মুসলমানে ধর্ম্ম-বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন পরমেশ্বরের প্রীতিবাঞ্ছা সকল ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, পরমেশ্বর এক, তাঁহাকে যেপ্রকারে সাধন করিবে তাহাতে সিদ্ধ হইবে। অতএব কোন ধর্ম্ম মন্দ বলা যায় না, সকল ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এক। সিকন্দর এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া দ্বাদশ জন মুসলমান পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিচারের পর, ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নতুবা তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ প্রাণদণ্ড স্বীকার করিলেন, তথাপি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইলেন না। হিন্দু-দিগের প্রতি সিকন্দরের এই প্রকার অত্যাচার ছিল।

তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধপ্রায় ছিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার আর দোষ ছিল না। তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এবং বিদ্বান লোকের যথোচিত গৌরব করিতেন। সিকন্দর ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১৬ অব্দে পরলোক গমন করিলেন।

এব্রাহেম।

সিকন্দরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র এব্রাহেম সিংহাসন আরোহণ করিলেন। এব্রাহেম অতি অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার এই সংস্কার ছিল, যে রাজারা ঈশ্বর তুল্য মনুষ্য, আর আর সকল মনুষ্য তাঁহাদের দাস। অতএব তিনি সকল মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন মন্ত্রী বা সভাসদ্ কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে বসিতে পারিবেন না, সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। এই প্রকার অহঙ্কার আচরণে তিনি সকলের অপ্রিয় হইলেন, এবং তজ্জন্য অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এব্রাহেম এই সকল বিদ্রোহ কতক নিবারণ করিলেন, কিন্তু অবশেষে পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তথাকার শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ, বাবরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, বাবর তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।

খৃঃ ১৫২৪
কং ৪৬২৫

বাবর তৈমুরলঙ্গের বংশীয়, অর্থাৎ তৈমুর তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। বাবরের পিতা ওমার সেখ প্রথমতঃ কাবুল রাজ্য পাইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তৎপরিবর্ত্তে ফরগনা রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। বাবর দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। তদনন্তর তিনি কাবুল রাজ্য অধিকার করেন, এবং আপনাকে তৈমুরলঙ্গের গোষ্ঠী বা প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষকে আপনার পৈতৃক রাজ্য জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকারের আকাঙ্ক্ষাতে ছিলেন। অতএব দৌলত খাঁ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি মহাহ্লাদে পঞ্জাবে আসিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং লাহোর ও আর কয়েকটা নগর অধিকার করিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। মধ্যে যাথথ রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কাবুলে যাইয়া ঐ উপদ্রব শান্তি করিলেন। তৎপরে ভারতবর্ষে আসিয়া পানিপতে দিল্লীর রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দিল্লীশ্বর এক লক্ষ সেনা এবং এক সহস্র রণমাতঙ্গ লইয়া গিয়াছিলেন। বাবরের কেবল ১২,০০০ পদাতি সেনা ছিল; অতএব তিনি স্বয়ং আক্রমণ করিতে না

পারিয়া চারি দিগে বক্ষঃপ্রমাণ উচ্চ মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া সৈন্যগণকে তন্মধ্যে রাখিলেন, এবং কামান সকল চর্ম্মশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া সম্মুখে সারী দিয়া রাখাইলেন। এব্রাহেমও তদ্রূপায় সৈন্যগণকে দুর্গবন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু শত্রু আগে আসিয়া আক্রমণ করিবার অপেক্ষা না করিয়া ব্যস্ত হইয়া আপনি শত্রুর গড় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বাবরের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না. তাহারা গড়ের মধ্যে থাকিয়া কেবল কামান ছাড়িতে লাগিল। অনন্তর তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবার মানস করিল, তাহাতে আপনারাই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন বাবর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে এব্রাহেমের তাবৎ সৈন্য পলায়ন করিল, রণক্ষেত্র শবে পূর্ণ হইল, এব্রাহেম আপনি হত হইলেন, এবং বাবর দিল্লীর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

খৃ ১৫২৬
হি০ ৯৩২৮

এই অবধি পাঠান ও তদ্বংশীয়দিগের রাজ্য শেষ হইল। পাঠান রাজারা প্রায় তিন শত বৎসর এই দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কোন গোষ্ঠী বা পরিবার তিন পুরুষের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এই পাঠান রাজাদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রীত দাস ছিলেন। তাঁহারা রাজানু-

গ্রহে হউক বা দুর্ব্বৃত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! ইহাদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ অতি অবনতভাবে ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সেনারা হিন্দুধর্ম্মে দ্বেষ করিত, এবং হিন্দুগন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে কি প্রকারে সুখী বা দুঃখী করেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। এই রাজাদিগের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য থাকিলেও দেশের সুখ ও সৌভাগ্য একেবারে যায় নাই। তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে এক একবার অত্যন্ত অত্যাচার ও মধ্যে মধ্যে কুশাসন হইত বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে উত্তমরূপে শাসন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রাজত্ব কালে প্রজারা সুখী ও সৌভাগ্যশালী ছিল। ইতি।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।